রাজরাণী হও

বিমল মিত্র

 উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ
মাঘ, ১৩৪৮
জানুয়ারী, ১৯৪১

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ চিত্র ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য

'বিমল মিত্র' একটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয় নাম। শরৎচন্দ্রের পর আর এত জনপ্রিয় লেখক বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন নি। তাঁর গ্রন্থগুলি শুধু বাঙালী-প্রিয় তাই-ই নয়, তিনিই একমাত্র লেখক যাঁর বই ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়ে তাঁকে সর্বভারতীয় লেখকরূপে পরিচিত করেছে। বর্তমানে তাঁর বই সুদূর আমেরিকা থেকেও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু জনপ্রিয় হওয়ার একটা বিপদও আছে। প্রত্যেক জনপ্রিয় জিনিসই নকল হয়। বিমল মিত্রের ভাগ্যেও তাই হয়েছে। এতে শুধু তাঁরই ক্ষতি হয়নি, অন্যান্য লেখকদেরও পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়েছে। একই বই বিভিন্ন মলাটে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত করে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাঙালী লেখককুলকে এবং পাঠক-সমাজকে প্রতারণা করছে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, বইয়ের ভিতর 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি' দেখে পাঠক-সমাজও কিছুটা সচেতন হয়েছেন, এবং নকল বইয়ের মধ্যেও আমরা 'বিমল মিত্র'কে আরো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। আমাদের এই প্রচেষ্টাও কিয়ৎ পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছে।

এবারে আমরা 'রাজরাণী হও' প্রকাশ করে প্রমাণ করতে চাই যে, বিমল মিত্রের নামটি মূলধন করে এই সব অসাধু প্রকাশক আর তেমন করে আর ব্যবসা চালাতে পারবে না। মেঘ যেমন চিরকাল থাকে না, সূর্য যেমন ভাস্বর হয়ে থাকে, তেমনি নকল বইও চিরকাল চলবে না। আশা করি, পাঠক-পাঠিকারা পূর্বের মতোই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। নমস্কার রইল।

প্রকাশক

বিয়ের সময় মা আশীর্বাদ করেছিল, তুমি রাজরাণী হও মা। স্বামী, পুত্র, শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে সুখে ঘর-করনা করো।

আশ্চর্য, মায়ের সেই আশীর্বাদ যে এমন করে মিথ্যে হয়ে যাবে, তা কে জানতো! তাহ'লে গল্পটা গোড়া থেকেই বলি। বাইরের লোকের কাছ থেকে যে কত রকমের গল্প পাওয়া যায়, তা ভাবলেই অবাক হয়ে যাই।

এবার বারাণসীতে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ঘুরে বেড়ানো। তারপর একে-একে যখন পরিচিতরা টের পেয়ে গেল যে আমি এসেছি, তখন সবাই এল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

বারাণসী আমার পুরনো জায়গা। প্রায় প্রতি বছরই পুজোর পরে আমি সেখানে যাই। নানা সূত্রে আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে। বলতে গেলে তাঁরা সবাই-ই সাহিত্য-রসিক। তাই সাহিত্য-রসিক মাত্রই আমার বন্ধু-স্থানীয়।

এঁদের মধ্যে একজনের নাম ডঃ নিরঞ্জন শর্মা। ডক্টরেট পেলেই সবাই সাহিত্য-রসিক হয় না, কিন্তু ডঃ শর্মার কথা আলাদা। তিনি দু'টো বিষয়ে এম-এ, এবং উপরন্তু ডক্টরেট। ডক্টরেট তো সংসারে গাদা-গাদা। ওটার আজকাল আর কোনও চমক নেই। কিন্তু শর্মাজীর কথা সত্যিই আলাদা। তিনি প্রায় রোজই সন্ধ্যেবেলা আমার ঘরে আসতেন এবং আমিও মনের মত লোক পেয়ে প্রাণ ভরে সাহিত্য-আলোচনা করতাম।

তিনি নিজে 'নাগরী প্রচারিণী' সভার সম্পাদক। এবং তাঁর স্ত্রী আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে যে মেয়েদের স্কুল আছে তার শিক্ষিকা।

ডঃ শর্মা বলেছিলেন, আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে একজন মহিলা আছেন, তাঁকে নিয়ে যদি কখনও গল্প লেখেন তো সেটা লোকের খুব ভালো লাগবে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

শর্মাজী বলেছিলেন, মহিলাটি একজন খুনী। খুনের দায়ে তার যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল।

আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন?

শর্মাজী বলেছিলেন, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড দাদা। আপনি যদি তাকে নিয়ে কখনও গল্প লেখেন তো আমি খুব খুশী হবো। আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সব শুনেছি। মহিলাটি ভালো লেখা-পড়া জানে না। কিন্তু খুব সচ্চরিত্র।

—খুনী মেয়ে কী করে সচ্চরিত্র হয়?

শর্মাজী বললেন, হয়। নইলে মা কেন তাকে শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় দেবেন। মহিলাটি সব কথাই খুলে বলেছে মা'কে। তাঁর মুখ থেকেই আমার স্ত্রী সব শুনেছে। আশ্রমের সব কাজের ভার এখন সেই মহিলাটির ওপর। অত বড় বিশ্বাসী মেয়ে আশ্রমে আর কেউ নেই। তাই মা নিজে তার হাতে ভাঁড়ারের চাবি তুলে দিয়েছেন।

—নাম কী মহিলাটির ?

শর্মাজী বললেন, অনিলা। নামেও অনিলা, কাজেও সত্যি-সত্যিই অনিলা। চৌদ্দ বছরের জেল হয়েছিল। যার মানে 'ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ্'। সেটা কমে আট বছরে দাঁড়িয়েছিল। আট বছর জেল খাটা কি সোজা কথা ?

আট বছর পরে। আটও হতে পারে আবার সাড়ে সাতও হতে পারে। ও সব সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব ছিল না তার। জেনানা ফাটকে কোথা দিয়ে বছরের পর বছর কেটে গেছে, তার হিসেব রাখা সম্ভবও নয়।

সব মিলিয়ে চোদ্দ বছরের মেয়াদ। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড-ভোগের কথা। কিন্তু বোধহয় তার ওপর দয়া হয়েছিল কর্তাদের। তার সম্বন্ধে রিপোর্টও ভালো ছিল। কখনও কাউকে গালাগালি দেওয়া দূরের কথা, একটু কড়া কথাও বলেনি সে। তাই যখন সে শুনলো যে, তাকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয়নি।

একজন মেয়ে ওয়ার্ডার তাকে এসে প্রথম খবরটা দিলে।

বললে, দিদি শুনছেন, আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে!

জিজ্ঞেস করলে, তার মানে ? আমার তো এখানে চোদ্দ বছর থাকার কথা! ছেড়ে দেবে কেন হঠাৎ ?

সুশীলা বললে, জানি না, এই তো বড় দিদিমণির কাছে শুনলাম।

—ঠিক শুনেছিস তো ?

সত্যি-সত্যিই কথাটা প্রথমে কেউই বিশ্বাস করতে চায়নি।

এমন ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। আগেও খুনের অপরাধে অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ক্বচিৎ কয়েকজনকে সাড়ে সাত বছর পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক আসামীর নামে নাকি আলাদা-আলাদা ফাইল থাকে। সেই ফাইলে আসামীদের সব কিছুর রেকর্ড লেখা থাকে। কে কেমন ব্যবহার করছে, কে কতবার কর্তাদের হেনস্থা করেছে। কথায়-কথায় নালিশ তো সকলের লেগেই আছে। অথচ এতদিন তো তাদের ফাঁসি হয়ে যাবার কথা ছিল। নেহাৎ হাকিমের দয়ায় ফাঁসি না হয়ে হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! যাদের ফাঁসি হয়ে যাবার কথা, তাদের ফাঁসি না হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। এর জন্যে তো তাদের ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত! কিন্তু তা নয়, পান থেকে চুন খসলেই তাদের যত রাগ। ভাত একটু ঠাণ্ডা হলে কিম্বা তরকারীতে একটু নুন বেশী হলেই তারা একেবারে লঙ্কা-কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।

কিন্তু অদ্ভুত এই আসামী অনিলা বিশ্বাস। জেনানা-ফাটকের ইতিহাসে নাকি এমন ভদ্র নিরীহ আসামী আগে আর কখনও আসেনি।

বলতে গেলে জেলখানার মধ্যে সুশীলাই অনিলাকে একটু বেশী খাতির করতো। সুশীলা জেলখানায় কতবছর কাজ করছে কে জানে। বেশ দশাসই পুরুষালি চেহারা। কালো কুচকুচে গায়ের রং। প্রথম দিনেই চুপি-চুপি অনিলাকে বলে গিয়েছিল, পান-দোক্তা খাওয়ার নেশা আছে নাকি আপনার ?

অনিলা বলেছিল, না।

সুশীলা বলেছিল, নেশা থাকলে বলবেন। লজ্জা করবেন না। আমার নাম সুশীলা। আমি এখানকার সবাইকে নেশার খোরাক জোগাড় করে দিই। আমাকে জেলখানার কর্তা থেকে গেটের দারোয়ান পুলিশ পর্যন্ত খাতির করে।

অনেক পীড়াপীড়ির পরও অনিলা রাজি হয়নি। বলেছিল, না আমার কোন কিছুরই দরকার নেই।

তারপর কথাটা অনেকবার বলেছে সুশীলা। যেন শ্রীমতী অনিলা বিশ্বাসকে ও কোনও রকমে খুশী করতে পাবলেই সে সুখী হবে।

শেষকালে অনিলা বলেছিল, কেন আমাকে ওসব লোভ দেখাচ্ছ ভাই, আমার কোনও কিছুরই দরকার নেই। তোমরা আমাকে খেতে না দিলেও আমি কিছু বলবো না। আমি কিছুই চাই না তোমাদেব কাছে। আমার ফাঁসি হয়ে গেলে আমি আরো খুশী হতাম !

সুশীলা তার বাপের জন্মে এমন আসামী আগে আর দেখেনি।

একদিন অনিলার কাছে বসে খুব ভাব জমিয়েছিল। তারপর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা দিদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

অনিলা বলেছিল, কী বলবে বলো না !

সুশীলা জিজ্ঞেস করছিল, আচ্ছা দিদি, আপনি কি সত্যিই খুন করেছিলেন ?

অনিলা প্রথমে কিছু বলেনি, শুধু চুপ করে কথাটা শুনেছিল।

—আপনি বলুন না দিদি, আমার বড় জানতে ইচ্ছে করছে !

—যা বলবার আমি তো হাকিমের কাছে সব বলেছি।

সুশীলা বলেছিল, কিন্তু আমি তো কোর্টে ছিলুম না। এখানকার খাতায় দেখলুম লেখা আছে, আপনি খুনের আসামী। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার তা বিশ্বাস হয় না। খুনের আসামী তো আমি আগেও অনেক দেখেছি। কিন্তু আপনার চেহারা দেখে বিশ্বাসই হয় না যে, আপনি কাউকে খুন করতে পারেন। বলুন না দিদি সত্যিই আপনি খুন করতে পারলেন ?

অনিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, মানুষ সব করতে পারে !

—কিন্তু তা বলে আপনি ? আপনার মত এত ভালো মানুষ আমি জীবনে দেখিনি যে !

—বাইরে থেকে দেখে মানুষকে কি চেনা যায় ?

সুশীলা বলেছিল, হ্যাঁ চেনা যায়। আমি এখানকার সব মানুষকে চিনতে পারি। আর আমি এতদিন এখানে চাকরি করছি, মানুষ দেখে-দেখে আমার চুল পেকে গেল, আমি মানুষ চিনবো না ?

অনিলা এ-কথার কোনও উত্তর দেয়নি।

সুশীলা আরও জিজ্ঞেস করেছিল, সংসারে আপনার আর কে আছে দিদি ?

অনিলা বলেছিল, আমার ছেলে।
—কত বয়েস আপনার ছেলের ?
—এত কথা আমায় কেন জিজ্ঞেস করছো সুশীলা ? এত কথা জেনে তোমার কী লাভ হবে ?
—আমার বড় ভাল লাগে জানতে। যেদিন আপনি প্রথম জেলখানায় ঢুকলেন, সেইদিন থেকেই আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। দেখেন না, আপনি এখানে আসার পর থেকেই আমি সব কাজ ফেলে আপনার কাছে বেশীক্ষণ কাটাই। আর আপনার কাছে বেশীক্ষণ কাটাই বলে অন্য মেয়েরা কত কথা শোনায় আমাকে।
অনিলা বলেছিলো, সত্যিই, তুমি আমার কাছে বসে থেকো না। তোমার কত কাজ চারদিকে, ওরা তো কথা শোনাবেই।
—আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি কী ভাবেন এত সময় ?
সত্যি, অনিলার কি কম ভাবনা! সে-সব কথা তো পরকে বলা যাবে না। বললে তারা বুঝবেও না। সমস্তক্ষণ একলা-একলা খোকার মুখখানা ভেবে-ভেবেও যেন কুল-কিনারা পেত না। চোদ্দ বছর। চোদ্দ বছর এইখানে কাটাতে হবে তাকে। চোদ্দ বছর কি অনিলা বাঁচবে ? আর যদি বাঁচেও, বাড়ি ফিরে গিয়ে কী দেখবে ? সেই বাতাবীলেবু গাছটা তখন হয়তো আর দেখতে পাবে না সে। কত বড়-বড় বাতাবী-লেবু হতো, সেই লেবুগাছতলায় খেলা করতো খোকা। চোদ্দ বছর পরে হয়তো বাড়ি গিয়ে খোকাকে দেখতেই পাবে না সে!
হঠাৎ সুশীলা এসে বলতো, দিদি, আপনার ভাত নিয়ে এসেছি, খেয়ে নিন।
প্রথম প্রথম অনিলা ভাবতো তার সমস্ত জীবনটা বুঝি এই জেলখানার মধ্যেই কেটে যাবে। কোথা দিয়ে সূর্য উঠবে, কোথা দিয়ে সন্ধ্যে হবে, কিছুই সে দেখতে পাবে না। তার নিজের জীবনের সূর্যোদয় যেমন সে দেখতে পায়নি, তেমনি তার জীবনের সূর্যাস্তটাও সে দেখতে পাবে না। এইখানে এই কয়েদখানার মধ্যেই তার জীবনের পূর্ণচ্ছেদ ঘটবে।
কিন্তু কোত্থেকে কে যে তার কাছে এই সুশীলাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে তাকে বেছে-বেছে ভালো জিনিসগুলো রান্নাঘর থেকে এনে দিত। বলতো, আজকে আপনার জন্যে একটা সন্দেশ এনেছি দিদি।
সন্দেশ! সন্দেশ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল অনিলা। বরাবর ধান মেশানো চালের মোটা অসেদ্ধ ভাত আর তরি-তরকারীর ঘ্যাঁট। এই তার দু'বেলার খাদ্য! এর মধ্যে সন্দেশ কোথা থেকে এল!
—সন্দেশ কোথা থেকে পেলে ? কে পয়সা দিলে ?
সুশীলা বলতো, বাজার থেকে বাইরের জিনিস এখানে আনবার কায়দা আছে! ভেতরে সবই পাওয়া যায় পয়সা ফেললে! পান-দোক্তা দরকার হলে তাও পাওয়া যায়! যাদের আফিমের নেশা, তারা লোক দিয়ে আফিমও আনিয়ে নেয়। আফিম থেকে সুরু করে বিড়ি-সিগারেট-মাছ-মাংস-সন্দেশ-রসগোল্লা সবই আনিয়ে নেয়!
অনিলা অবাক হয়ে বলেছিল, এর জন্যে টাকা-পয়সারও দরকার হয় তো। সেসব টাকা-পয়সা কোথা থেকে আসে ?

—টাকা-পয়সাও বাইরে থেকে আসে ! স্বদেশী বাবুদের আমলে পিস্তল-রিভলবারও আসত। সবই টাকার খেলা !

অনিলার মনে পড়ে যেত তার শ্বশুরের কথা। শ্বশুরও বলতো, সবই টাকার খেলা টাকা দিয়ে যেমন ধান-চাল-কাপড়-নুন-তেল-মশলা কেনা যায়, তেমনি পাপই বলো আর পুণ্যই বলো, টাকা দিয়ে সংসারে সবই কেনা যায় !

শ্বশুরের সামনে অনিলা ঘোমটা মাথায় দিয়ে গিয়ে দাঁড়াতো।

শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাস বড় হিসেবী মানুষ ছিল। দিন-রাত টাকার হিসেব নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। সোনার গয়না বন্ধক রেখে টাকা ধার দিত। অনেকে বন্ধকী গয়না আরও ছাড়াতেও পারতো না। সুদ দেওয়ার ক্ষমতাও থাকতো না অনেকের ! তখন সেগুলো নিজের সম্পত্তি হয়ে যেত শ্বশুরের। সেই টাকাগুলো শ্বশুরমশাই ব্যাঙ্কে রাখতো না, রাখতো পেতলের ঘড়ায়। পেতলের ঘড়াগুলো মেঝেতে গর্ত করে তাতে পুঁতে রেখে ওপরে বিছানা পেতে শুয়ে পড়তো। আর সামান্য কিছু টাকা ক্যাশ বাক্সতে রেখে কাজ চালাতো !

এক-একদিন হঠাৎ বৌমাকে দেখে অবাক হয়ে যেত শ্বশুরমশাই। একেবারে ভূত দেখার মতো চমকে উঠতো। টাকাগুলো তখনও ছড়ানো রয়েছে সামনে। শ্বশুর-মশাই মাঝে-মাঝে টাকাগুলো বাক্স থেকে বার করে গুণতো। সে সময় অন্য কেউ তার ঘরে আসুক তা সে চাইতো না।

হঠাৎ ঠিক সেই সময়ে মানুষের পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠে বলতো, কে ?

—আমি বাবা, আমি !

টাকা-পয়সাগুলো ধুতির কোঁচা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিত শ্বশুর-মশাই। তারপর মুখটা উঁচু করে বলতো, তা তুমি এ সময়ে কেন ? জানো তো এ সময়ে আমি কাজে ব্যস্ত থাকি।

—আপনার আফিম্ আর দুধ এনেছি বাবা !

—তা এর জন্যে এ ঘরে আসবার কী দরকার ছিল ? আমাকে ডাকলেই তো আমি বাড়ির ভেতরে যেতে পারতুম !

তা তখন আর কিছু করবার নেই। বউমা ততক্ষণে যা দেখবার সব দেখে ফেলেছে।

শ্বশুর বলতো, দাও—

আফিমের গুলিটা বউমার হাত থেকে নিয়ে শ্বশুর মুখে ছুঁড়ে দিত। তারপর দুধের বাটিটা নিয়ে দুধটা চুমুক দিয়ে খালি বাটিটা বউমার হাতে দিয়ে বলতো—এবার থেকে বউমা, তোমাকে আর কষ্ট করে আমার ঘরে আসতে হবে না, আমাকে একবার ডাকলেই আমি বাড়ির ভেতরে গিয়ে দুধ খেয়ে আসবো। বুঝলে ?

আসলে বউমা শ্বশুরের টাকা-কড়ি, গয়না-টয়নার পাহাড় দেখে ফেলবে, এটা শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসের ভালো লাগতো না।

সেদিন থেকেই হেমন্ত বিশ্বাস সাবধান হয়ে গেল। বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়তো তখন বিছানাটা উঠিয়ে পেতলের ঘড়ার ভেতর থেকে টাকা-গয়না সব বার করতো। তারপর একটা কাগজের টুকরোয় সব লিখে রাখত। তা থেকে আবার বেশী রাত পর্যন্ত জেগে পাকা খাতাটায় লিখে রাখতে হতো। সেই পাকা খাতাটা আবার যেখানে-সেখানে রাখলে চলবে না। বাইরে রাখলে কেউ না কেউ দেখলে

ফেলবে।

সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়তো অনিলার।

সুশীলা মাঝে-মাঝে এসে পাশে বসতো।

বলতো, কী এতো ভাবছেন দিদি ?

অনিলা বলতো, ভাবনার কি শেষ আছে ভাই। আর না ভেবেই বা করবো কী ? আর তো কোনও কাজ নেই আমার !

সুশীলা বলতো, অত ভাবা ছেড়ে দিন তো আপনি ! এখানে কত লোক এল গেল, কত লোকের ফাঁসি হয়ে গেল দেখলুম, কেউ তো আপনার মত এত ভাবে না। দেখবেন কোথা দিয়ে যে চোদ্দ বছর কেটে যাবে, শেষকালে টেরও পাবেন না। এখানে এসে কত লোকের শরীর ভালো হয়ে গেছে, তাও দেখেছি আমি !

চোদ্দ বছর।

চোদ্দ বছর যে কী করে তার কাটবে, তাই ভেবেই অনিলা প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয় পাওয়াটা অন্যায় কিছু নয়। 'জেল' কথাটা কানে শোনা ছিল অনিলার। লোকে খুন করে ফাঁসি-কাঠে ঝোলে, তাও লোকের মুখে শুনেছিল সে ! কিন্তু সেই তাকেই যে একদিন জেলখানাতে আসতে হবে, তা সে-কি কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিল !

জীবন জিনিসটা যে কী, তা ছোটবেলায় অনিলা বুঝতে পারেনি। বাপ মারা গিয়েছিল কবে তা মনে নেই। লোকে বলতো তার বাবা নাকি খুব ভালো মানুষ ছিল। কিন্তু সে তো শোনা কথা ! বাবাকে অনিলা দেখেনি, কিন্তু মাকে দেখেছে। অনেক কষ্টে মা তাকে মানুষ করেছিল। বলতে গেলে মা নয়, মাসির কাছেই সে মানুষ হয়েছিল।

মাসি মা'কে সান্ত্বনা দিত। বলতো, কিছু ভাবিসনি তুই, আমি তো বেঁচে আছি। আমি ঠিক তোর মেয়ের একটা হিল্লে করে দেব। মেয়ের জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

মা'র অম্বলের অসুখ ছিল। যখন অম্বল হতো তখন মা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতো। কবিরাজ বলে দিয়েছিল রোগটার নাম 'অম্লশূল'।

'অম্লশূল' রোগে নাকি বড় কষ্ট ! কিন্তু নিজের বিধবা বোন বলে মাসিমা মা'কে যতদূর সাধ্য যত্ন করতো। মা'র জন্যে বিশেষ-বিশেষ রান্না করে দিত। মা বলতো, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না দিদি, আর বেশী দিন তোমাকে কষ্ট দেব না—

মাসি বলতো, তুই থাম তো, বেশী বক্‌-বক্‌ করিসনি। আমি যখন আছি তোর ভাবনাটা কীসের ?

মেসোমশাই মানুষটাও ভালো ছিল খুব। মাসির সঙ্গে যখন মেসোমশাই-এর বিয়ে হয়, তখন তার ভালো অবস্থা ছিল না। অনিলার বাবার মতই অবস্থা ছিল তার।

কিন্তু পুরুষের ভাগ্য কখন খোলে তা কি বলা যায় ?
মেসোমশাই-এর অবস্থাও একদিন ভালো হয়ে গেল। বড়লোক হয়ে গেলেও কিন্তু শালীব ভালো-মন্দের দিকটা দেখতে ভোলেনি। মা কেবল মাসিকে বলতো, আমার অনিলার একটা ব্যবস্থা করে দিও দিদি, ও মেয়েটাই যে আমার গলায় কাঁটা হয়ে ফুটছে।
শেষকালে অনেক বলার পর তবে একটা পাত্র জুটলো।
পাত্র ভালোই। পাত্রের বাপ হেমন্ত বিশ্বাস মহাজন মানুষ। কুসুমগঞ্জের বাদা অঞ্চলে প্রায় নিজস্ব দেড় হাজার বিঘে ক্ষেত-জমি আছে। তাতে ভাগে চাষ-বাস করায় হেমন্ত বিশ্বাস। তাতে নিজেদের খাবার রেখেও মোটা টাকা আমদানি হয়। কুসুমগঞ্জের লোকেরা হেমন্ত বিশ্বাসকে খুব ভক্তি করে। তারই ছেলে হল পাত্র। নাম বসন্ত।
বসন্তকে একদিন দেখে পছন্দ করে এলো মেসোমশাই।
এসে বললে, সব ব্যবস্থা পাকা করে এলাম, বুঝলে গো ?
মাসিমা বললে, দিতে-থুতে হবে কী রকম ?
মেসোমশাই বললে, হেমন্ত বিশ্বাস মশাই-এব কি কম টাকা ? সে-কি টাকার ভিখিরী ?
মাসিমা জিজ্ঞেস করলে, আর পাত্তোর ?
—পাত্তোরকে দেখলে সকলের চোখ কপালে উঠবে ! এমন চেহাবা।
তা এও বোধহয় কপাল ! নইলে বিধবাব একমাত্র মেয়ে, অনিলার কপালে এমন পাত্র জুটবে, এটা কে কল্পনা করেছিল ?
পাত্র বসন্ত যেমন দেখতে, তেমনি শিক্ষিত। সে মেয়ে দেখতেও চাইলে না। বললে, বাবা যখন পাত্রী পছন্দ করেছে তখন আর তা দেখবার কী আছে।
কলকাতায় থেকে সে বি-এ পাশ করেছে। বুদ্ধি-বিবেচনা ভালো।
বসন্ত বলেছিল, বিয়ে আমি করছি, কিন্তু কোনও যৌতুক নিতে পারব না।
হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, তাহ'লে বিয়ের খরচা কি আমি নিজের ঘর থেকে দেব বলতে চাস। দশটা গাঁয়ের লোক এসে পাত পেড়ে খাবে, তার জন্যে অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকা খরচ হবে। সে খরচাটা খামাকো আমি কেন করতে যাবো ?
বসন্ত বলেছিল, বিয়েতে পণ নেওয়া পাপ বলে আমি মনে করি।
হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া শিখে তোমার এই বুদ্ধি হয়েছে ? এমন হবে জানলে আমি তোমাকে লেখা-পড়া শেখাতাম না। আমার এত টাকা-কড়ি, সোনার গয়না, সেই মহাজনী কারবার, আমি মরে গেলে এসব তো তোমাকেই দেখতে হবে একদিন। তোমার মতি-গতি দেখে তো মনে হচ্ছে না, এসব তুমি রাখতে পারবে !
বসন্ত বাবার কথায় প্রথম প্রথম চুপ করে থাকতো। কিছু বলতো না। কিন্তু বেশী পীড়াপীড়ি করলে বলতো, বেশী টাকা থাকা কি ভালো ?
হেমন্ত বিশ্বাস ছেলের কথা শুনে চমকে উঠতো ! বলতো, তার মানে ? তুমি বলছো কী ? বেশী টাকা থাকা ভালো নয় ?
বসন্ত বলতো, না।

—কী বললে ?

যেন ভুল শুনেছেন কথাটা। যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না ছেলের মুখের জবাবটা। আবার জিজ্ঞেস করলে, কী বললে তুমি ? আবার ভালো করে বলো ?

বসন্ত বললে, আমি বলছি বেশি টাকা থাকা ভাল নয়।

হেমন্ত বিশ্বাস তবু যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না। বললে, বেশি টাকা থাকা ভাল নয় কেন ? বেশি টাকা থাকাটা কি দোষের ? যত বেশি টাকা থাকবে ততোই তো সুখ। টাকার অভাব তো কখনও বুঝলে না, তাই ও-কথা বলছো। যাদের টাকা নেই, তাদের অবস্থাটা একবার গিয়ে দেখে এসো। দেখে এসো গিয়ে কী অবস্থায় তারা দিন কাটাচ্ছে, কী দুরাবস্থার মধ্যে তারা আছে! শীতের দিনে গায়ে দেবার মত একটা জামা নেই, এক সের চাল কেনবার মত পয়সা নেই। অনেক সময়ে পুকুরের কলমীশাক সেদ্ধ করে নুন দিয়ে খাচ্ছে। তুমি ওসব দেখনি, কিন্তু আমি দেখেছি। তুমি অভাব কাকে বলে তা জানো না বলেই এই কথা বলছো। আমি তোমাকে নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা দিয়ে আরামে রেখেছি বলেই তুমি বলতে পারলে 'বেশি টাকা থাকা ভাল নয়'।

বসন্ত বললে, আমি তো বলিনি যে 'টাকা থাকা ভালো নয়'। আমি শুধু বলেছি যে 'বেশি টাকা থাকা ভালো নয়'।

—তা 'বেশি' বলতে তুমি কী বোঝ ? কত টাকা হলে বেশি টাকা হবে ? পনেরো হাজার ? বিশ হাজার, চল্লিশ হাজার না এক লাখ ?

বসন্ত বললে, আমি সে-সব জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, দরকারের বেশি টাকা থাকা অন্যায় !

—দরকার ? দরকারের মাপকাঠি কী ? একটা ভারি অসুখ হলে চিকিৎসার খরচটুকুও থাকবে না, এইটেই কি তুমি বলতে চাও ?

বসন্ত বললে, না, তাতো আমি বলিনি। গ্রামের সবাই গরীব থাকবে, খেতে পাবে না, পেটের দায়ে আপনার কাছে জমি বন্ধক রাখবে আর দরকারের সময় জমি ছাড়িয়ে নিতে পারবে না, আর অন্যদিকে আমরা মজা করে খাবো-দাবো, এটা ভালো নয়।

রাগে হেমন্ত বিশ্বাসের আগা-পাশতলা জ্বলতে লাগলো। বললে, তুমি তো আগে এ-রকম ছিলে না! এ-রকম হলে কবে থেকে ? এখন দেখছি তোমাকে কলকাতায় পাঠানোই আমার আহাম্মকি হয়েছে। এসব কথা কি কলেজের প্রফেসরেরা তোমাকে শিখিয়েছে নাকি ?

বসন্ত বললে, না, আমি এ-সব আমাদের ইকনমিক্সের বইতে পড়েছি। কার্ল মার্কসের বই পড়ে শিখেছি।

—কার্ল মার্কস ? না, কী বললে তুমি ?

বসন্ত বললে, কার্ল মার্কস !

—কার্ল মার্কস ? সে আবার কে ? কী বই লিখেছে ?

বসন্ত বললে, সে আপনি বুঝবেন না। তিনি একজন মহাপুরুষ, তিনি মানুষের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে বই লিখে গেছেন। অনেক লোক তাঁকে দেবতা বলে মানেন।

—দেবতা? অনেক দেবতার নাম শুনেছি। শিব, দুর্গা, কালী, গণেশ, কিন্তু কার্ল মার্কস বলে কোনও দেবতার তো নাম শুনিনি। কীসের দেবতা? কে তাকে পুজো করে? কারা তারা?

বসন্ত বললে, পৃথিবীর অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকই পুজো করে।

—পাঁজিতে তার নাম আছে?

বসন্ত বললে, না পাঁজিতে নেই, কিন্তু তাঁকে নিয়ে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ বই লেখা হয়েছে।

হেমন্ত বিশ্বাস বুঝলো জল অনেকদূর গড়িয়েছে।

বললে, যাক্‌গে, যা হবার তা হয়ে গেছে। এবার তো পাশ করে গেছ। এবার ও-সব কথা ভুলে যাও। কাল থেকে তুমি আমার কাজকর্ম দেখবে। আমার বয়েস হচ্ছে, আমিও আর বেশি দিন এত সম্পত্তি দেখাশোনা করতে পারবো না। তোমাকেই নিজে এ-সব কাজ করতে হবে। আমি চাই এখন থেকে তুমি সব বুঝে-সুঝে নাও।

হেমন্ত বিশ্বাস মুখে কথাগুলো বললে বটে, কিন্তু মনে-মনে বুঝলো, এ-ছেলেকে শোধরানো এখন শক্ত। তবু শক্ত হলেও চেষ্টা করতে হবে।

তাই পরের দিন থেকে বসন্তকে নিয়ে কাগজ-পত্র সব দেখাতে লাগলো। বললে, এই দেখ, এইগুলো হচ্ছে তমসুক। এইগুলো হচ্ছে জমা-খরচের হিসেব। কার কাছে কত টাকা পাই, কাকে কত টাকা দিয়েছি, কত বকেয়া পাওনা আছে, এতে তারই হিসেব লেখা আছে। এগুলো একদিনে বুঝতে পারবে না, বুঝতে সময় লাগবে। কিন্তু চেষ্টা করলে কী-ই না হয়? আমিই কি ছাই আগে বুঝতুম? চেষ্টা করে করে নিজেই বুঝে নিয়েছি। আর দেখ, এইগুলো হচ্ছে ম্যাপ, সেটেলমেণ্টের ম্যাপ। আমার কত জমি আছে তারই হিসেব।

প্রথম-প্রথম বসন্ত বাবার কাছে বসে কাগজ-পত্র দেখে বুঝতে শিখলো। হেমন্ত বিশ্বাসও মন প্রাণ দিয়ে ছেলেকে বোঝাতে লাগলো।

কিন্তু শুধু বোঝালে চলবে না। তাকে সংসারী করতে হলে প্রথম কাজ, তার একটা বিয়ে দিতে হবে। সেইদিন থেকেই পাত্রীর খোঁজে লেগে গেল হেমন্ত বিশ্বাস।

বাংলাদেশে কখনও বিয়ের পাত্রীর অভাব হয়নি, এখনও হলো না।

একে তো হেমন্তর বাড়িতে টাকার পাহাড়, তার ওপর পরিবার নেই। একটি মাত্র ছেলে—তা সেও আবার বি-এ পাশ। সেই পাত্রের সঙ্গে যার বিয়ে হবে, সে অভাবের মুখ কখনও দেখতে পাবে না।

কুসুমগঞ্জে মেয়ের অভাব নেই। অনেক লোকের অনেক অরক্ষণীয়া কন্যা আছে। তারা খবরটা পেলেই ঝুলোঝুলি আরম্ভ করে দেবে।

কিন্তু হেমন্ত এত সহজ লোক নয় যে, খবরটা রাতারাতি রটিয়ে দেবে আর একপাল মেয়ের বাপ এসে তার দরজায় ধর্ণা দেবে।

একজন খাতক এসে একবার খবর দিয়ে গিয়েছিল যে, দশ ক্রোশ দূরে দিনহাটাতে একটা বাপ-মরা মেয়ে আছে, সে দেখতে অপরূপ সুন্দরী। মেয়েটির মা আছে, কিন্তু বাপ নেই। তা না থাক। বাপ না থাকাই ভালো। বাপ থাকলে কথায়-কথায় বেয়াই-এর কাছে এসে টাকাটা-সিকেটা চাইবে। মেয়ের ভাইবোন কেউ নেই,

সেটাও ভালো। কথায়-কথায় তারাও জামাইবাবুর বাড়িতে এসে খেয়ে-থেকে যাবে, উৎপাত করবে। খরচের চূড়ান্ত হবে তখন। অথচ কুটুম মানুষদের কিছু বলাও যাবে না।
থাকবার মধ্যে আছে এক অম্বুলে রুগী মা। তা সেও বেশিদিন বাঁচবে না। থাকে ভগ্নিপতির বাড়ি। মানে তাদের গলগ্রহ।
হয়তো কিছু বরপণ দিতে পারবে না। তা বরপণ দিতে না পারলো তো বয়েই গেল। বরপণ না নিলে বরং হেমন্তর গুণ-গানই করবে লোকে।
বলবে, হেমন্ত বিশ্বাস মহাজনী কারবার করলে কী হবে, কঞ্জুষ নয়। ছেলের বিয়ে দিয়ে একটা আধলাও নেয়নি।
তাতে দুর্নামের বরং কিছুটা লাঘব হবে।
হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, মেয়ের গোত্র কী?
গোত্র-বংশ সবই পছন্দসই। সবই মিলে গেল। একদিন নিজে গিয়ে পাত্রীকে চর্মচক্ষে দেখেও এল হেমন্ত বিশ্বাস। সেই দেখার সঙ্গে-সঙ্গে একজোড়া সোনার বালা দিয়ে একেবারে আশীর্বাদও করলো। বললে, পাত্রকে একার ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন।
পাত্রীর মেসোমশাই যেন তখন হাতে সোনার চাঁদ পেয়েছে। বললে, দেখাদেখির আর কী আছে। দেখা আর আশীর্বাদ একসঙ্গেই করে আসবো আমি। তা সেই ব্যবস্থাই পাকাপাকি হয়ে গেল সেদিন। পাঁজি দেখে দিন-ক্ষণ স্থির হয়ে গেল।
অনিলার মনে আছে, সে-দিনটা একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চের মধ্যে কেটে গিয়েছিল। চিরকালের মত মাকে ছেড়ে পরের বাড়িতে চলে যেতে হবে, আর সেই বাড়িটাকেই নিজের বাড়ি বলে ভাবতে হবে, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি!
অনিলার ভয় হয়েছিল। মা বলেছিল, ভয় হচ্ছে কেন রে?
অনিলা বলেছিল, কোথায় পরের বাড়ি চলে যাবো, সেখানে কে আমাকে দেখবে, কে আমাকে যত্ন করবে কি করবে না। তুমি কোথায় থাকবে, আর আমি কত দূরে থাকবো।
মা বলেছিল, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে বিয়ে একদিন করতে হবে মা, আর মেয়ে-মানুষের বিয়ে হলে তো পরের বাড়ি যেতেই হয়। এ সকলের বেলাতেই হয় মা, আমারও তাই হয়েছে, তোমার মাসিমারও তাই হয়েছে। তোমার কিছু ভয় নেই মা, ভয় কী? একবার বিয়ে হয়ে যাক, তখন দেখবে আমার বাড়িতে আর তুমি আসতেই চাইবে না।
অনিলা বলেছিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে যে আমি তোমাকে দেখতে পাবো না মা!
মা বলেছিল, আমাকে না-ই বা দেখতে পেলে। তুমি তোমার স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করবে। রাজরাণী হবে। আমি আর মা কতদিন বাঁচবো? মা কি কারোর চিরকাল বেঁচে থাকে? তখন দেখবে আমাকে তুমি একেবারে ভুলে যাবে। আমার কথা মনেই পড়বে না তোমার! এরই নাম তো সংসার মা!
আশ্চর্য, বিয়ের পরদিন শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কী কান্নাটাই না কেঁদেছিল অনিলা! এখন ভাবলে হাসি পায়।
পাড়ার লোকেরা বর দেখে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।

সবাই বললে, অনেক তপস্যা করলে তবে এমন বর পাওয়া যায় গো। ছুঁড়ির কপালটা ভালো।
সত্যিই বসন্তকে দেখতে ভালো। অনেক তপস্যা করলেই অমন স্বামী মেয়েমানুষের কপালে জোটে বটে। আর শুধু তো চেহারা নয়, তার ওপর লেখাপড়া জানা বর! আর সকলের ওপর বাপের টাকা। টাকার খবরটা কেমন করে জানি না সারা গ্রামে রটে গিয়েছিল। লোকের মুখে-মুখে সবাই জেনে গিয়েছিল যে, বাপের দেড় হাজার বিঘের মত জমি-জমা আছে। তাছাড়া আছে টাকার পাহাড়।
তা কথাটা যে মিথ্যে নয়, তা বৌভাতের দিনেই বোঝা গেল। যারা নেমন্তন্ন খেতে এলো তারা বসন্তর বউ দেখে অবাক। একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোনার গয়নায় মোড়া।
বসন্ত নাকি আপত্তি করেছিল প্রথমে।
কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস শোনেনি! বলেছিল, তুমি থামো, আমার বাড়ির এই প্রথম আর এই-ই শেষ বিয়ে, বউকে না সাজালে লোকে বলবে কী? বলবে হেমন্ত বিশ্বাস গরীব মানুষ, তার টাকা নেই।
বসন্ত বলেছিল, টাকা না-থাকাটা কি লজ্জার?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, লজ্জার নয়? বলছো কী তুমি? যার টাকা নেই, তাকে কি লোকে ভালো চোখে দেখে? তাকে কি শ্রদ্ধা করে,সম্মান করে?
—শ্রদ্ধা আর সম্মান বড়, না ভালোবাসা বড়ো?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, শুকনো ভালোবাসায় কি পেট ভরে? এই যে তোমার বৌভাতে আজ দশখানা গ্রামের লোক আমার বাড়িতে পাত পেড়ে খাবে, এতে তারা খুশী হবে না বলে মনে করো? সবাই খেয়ে আমাকে ধন্য-ধন্য করবে, তা জানো?
—আমি তা মনে করি না। সবাই পেট পুরে খাবে, কিন্তু মনে-মনে সবাই আপনাকে হিংসে করবে।
—হিংসে করবে? হিংসে করবে কেন?
—আপনার টাকা আছে বলে হিংসে করবে। তারা পেট পুরে খেয়ে বলবে, বিশ্বাসমশাই আমাদের খাইয়ে তার ঐশ্বর্য দেখাচ্ছে। এতে তারা আপনাকে অভিশাপ দেবে।
—তাহ'লে কি বলতে চাও আমি আমার রক্ত-জল-করা টাকাগুলো পরকে বিলিয়ে দিই? তুমি কি তাই-ই চাও?
—আমি কি বলেছি, আপনি টাকাগুলো পরকে বিলিয়ে দিন?
—প্রকারান্তরে তাই-ই তো তুমি বলছো।
বসন্ত বললে, না, আমি তা বলছি না। আমি আপনার ঐশ্বর্য এত ঘটা করে পরকে দেখাবেন না। দেখালে যাদের নেই, তাদের মনে কষ্ট হবে!
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, ছেলে-মেয়ের বিয়েতেই তো লোকে ঘটা করে। এই সব ব্যাপারে যদি ঘটাই না করি, তো কবে ঘটা, করবো? আমার যে টাকা আছে, তা কবে কি করে লোককে দেখাবো তা হলে?
বাড়িতে একটা গৃহিণী নেই, মা-পিসী-মাসী-দিদি-দিদিমা-ঠাকুমা নেই যে ব্যবস্থা করবে। বিয়ের ব্যাপারে যা-কিছু করণীয় সবই করছে পাড়ার মেয়েরা। তারাই

বউ-বরণ, ফুলশয্যা, গায়ে-হলুদের ব্যাপারট্যাপার সব কিছুতেই সাহায্য করেছিল। বসন্ত যখন নতুন বউ নিয়ে কুসুমগঞ্জের বাড়িতে এল তখন পাড়ার ন'কাকিমা, বড়-পিসিমারাই বউকে বরণ করে ঘরে তুললো। অচেনা জায়গা, অচেনা মুখ, অচেনা পরিবেশ। কান্না পেতে লাগলো অনিলার। কার সঙ্গে সে তার মনের কথা বলবে তাও সে ভেবে পেলো না।

নতুন বউ-এর মুখ দেখে সবাই বাহবা দিয়ে উঠলো।

কে একজন বুড়ি মতন মহিলা এসে অনিলার বেনারসী ঘোমটা তুলে বলল, ওরে, এ যে সগ্যের অপ্সরাকে বিয়ে করে এনেছিস রে বসন্ত, তুই কত ভাগ্যি করেছিলি রে। তোর বউ-ভাগ্যি তো ভালো।

সবারই মুখে ওই একই কথা! বললে, যুগ্যি ছেলের যুগ্যি বউ!

কথাগুলো সকলের কানেই গেল। হেমন্ত বিশ্বাস একদিনের জন্যে তার প্রাত্যহিক কাজ থেকে ছুটি নিয়েছিল। জামা-কাপড় পরে শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসের সেদিন অন্য চেহারা। অন্যদিন হেমন্ত বিশ্বাস গায়ে শুধু একটা ফতুয়া পরেই থাকে। আর পরনে থাকে একটা মোটা আটহাতি ধুতি। ওইতেই দিন কেটে যায়। হেমন্ত বিশ্বাসের তাতে খরচও বাঁচে আর আরামও হয়।

তা সেদিন কাল-রাত্রি। অনিলাকে একলা রাত কাটাতে হলো না। আশে-পাশের বাড়ি থেকে মেয়েরা এসেই তাকে সঙ্গ দিলে! কত রকমের গল্প-গুজব-হাসি-ঠাট্টাতে কোথা দিয়ে যে দিনটা কেটে গেল বোঝা গেল না। কে একজন পাড়ার বুড়ি দিদিমার বয়েসী মেয়েমানুষ বললে, আজ নাত-বউ-এর পাশে আমি শোব, আজকে আর নাতির সঙ্গে তোমাকে শুতে নেই।

দিদিমার কথায় অন্য মেয়েরা সবাই হেসে উঠলো।

তার পরদিনই ফুলশয্যা বা বৌভাত। সমস্ত বাড়িখানা একেবারে লোকে-লোকারণ্য। গ্রামের মহাজনের একমাত্র ছেলের বিয়ে। সেদিন আর কারো বাড়িতে রান্না হলো না। দশখানা গ্রামের লোক ঝেঁটিয়ে এসেছে নেমতন্ন খেতে।

অনিলার আজও মনে আছে সে-দিনটার কথা!

সকাল থেকে নানা-রকম রান্নার গন্ধতে বাড়িটা ভুর ভুর করছে। হেমন্ত বিশ্বাস কৃপণ মানুষ হলে কী হবে। ছেলের বিয়েতে একেবারে মুক্তহস্ত। তোমরা দেখে যাও আমি ছেলের বিয়েতে কত খরচ করছি। একটা কানা-কড়িও আমি নিইনি পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে। তোমরা আমাকে কৃপণ-সুদখোর মানুষ বলো, তা আমি জানি। কিন্তু এবার দেখে যাও, আমি কত খরচও করতে পারি। লুচি করেছি, আবার পোলাও-ও করেছি। দু'রকম মাছ। পোনা মাছ আর বাগদা চিংড়ি। যারা নিরামিষ খাবে তাদের জন্যে আলু-পটলের দোর্মার সঙ্গে ছানার ডালনাও করেছি। আর মিষ্টি? মিষ্টিই কি কিছু কম করেছি তা বলে! রসগোল্লা, পানতুয়া, দরবেশ, ছানার জিলিপি, আবার-খাবো সন্দেশ, রাবড়ি, দই, পাঁপড়ভাজা। কোন কিছুরই কমতি নেই। খরচ করতে বসেছি যখন—তখন আর হাত-টান করিনি কোনও ব্যাপারেই। আর পাত্রীর বাড়ির ফুলশয্যার তত্ত্ব দেখে তোমরা নিন্দে করো না। আমি তো কুটুমের পয়সা দেখে সম্বন্ধ করিনি। আমি শুধু দেখেছি মেয়ের রূপ আর দেখেছি মেয়ের গুণ।

—ও মুকুন্দ, তুমি হাত গুটিয়ে বসে কেন ? খাও, হাত চালাও।
মুকুন্দ বলে, খাচ্ছি তো খুড়োমশাই, কিন্তু এত আয়োজন করেছেন যে আর পেটে ধরছে না।
হেমন্ত প্রত্যেকের কাছে গিয়ে-গিয়ে ওই একই কথা বলছেন—কী রকম বউ দেখলে বলো হরিহর। এমন বউ আগে আর কারো ঘরে এসেছে ?
হরিহর গ্রামের মিস্ত্রি মানুষ। খেতে পেয়ে একেবারে বর্তে গেছে।
পেটে আর তার ধরে না, তবু গোগ্রাসে গিলছে। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, রাজপুত্তুরের বউ কি আর ঘুঁটেকুড়ুনীর মত হবে দাদামশাই ? যুগ্যি জায়গায় যুগ্যি কনেই এয়েচে।
অনিলা যে ঘরে বউ হয়ে সোনার গয়নায় মুড়ে বসেছিল তার পাশের ছাদেই লোকেরা খেতে বসেছিল। সব কথাই টুকরো-টুকরো ভাবে তার কানে আসছিল। মাসিমা-মেসোমশাই মা সবাই এসেছিল। যাবার আগে সবাই এসে দাঁড়ালো। বললে, যাই রে বুড়ি, তোর কপাল ভালো যে এমন রাজ-বাড়িতে পড়েছিস। রাত হয়ে যাচ্ছে, আমরা আসি মা। স্বামী-সংসার নিয়ে সুখে ঘর করো, রাজরাণী হও, এই আশীর্বাদ করি মা। আর দু'দিন পরেই বেয়াই মশাইকে বলে তোমাকে নিয়ে যাবো। একদিন একটু কষ্ট-সষ্ট করে থাকো মা।
অনিলা আর কী বলবে। তার চোখ দু'টো তখন কান্নায় ছলছল করছে।
মা চিবুকে হাত দিয়ে বললে, ছি, কাঁদে না মা, কাঁদতে নেই। অনেক ভাগ্য করলে এমন ঘর-বর পাওয়া যায়, তবু তোমার কান্না আসছে, ছিঃ—
অনিলা বলতে গেল, মা তোমার শরীরের দিকে একটু যত্ন নিও—কিন্তু বলতে গিয়েও কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরোল না। চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে এল। গলাটা কান্নায় বুজে এল। সবাই চলে গেল।

সুশীলা সেদিন সব দেখে অবাক। বললে, এ কি দিদি, কিছুই খাননি যে আপনি ? সবই পড়ে রয়েছে যে।
অনিলা বললে, আর খাবো না সুশীলা আমার ক্ষিধে নেই।
—তা আপনারই বা দোষ কী ? কত বড় ঘরের বউ আপনি আমি কি তা জানি না, আমি সবই শুনেছি। জেলখানার এসব খাবার আপনার মুখে রুচবে কেন ?
বলে এঁটো থালাটা ভাত সুদ্ধ তুলে নিয়ে যায়। সুশীলার অনেক কাজ। জেনানা-ফাটকে আরো অনেক কয়েদী আছে, তাদেরও দেখতে হয় তাকে। কাজে গাফিলতি হলে তাকেও গাল-মন্দ খেতে হয়। তাই বেশিক্ষণ বসতে পারে না অনিলার কাছে।
তবু সময় পেলেই দৌড়ে আসে। এসে বলে, একটু হাঁ করুন তো দিদি, হাঁ করুন—অনিলা বুঝতে পারে না। বলে, কেন হাঁ করতে যাবো কেন ? হাতে কী তোমার ? সুশীলা তবু জোর করে। বলে, হাঁ করুন না একটু, একটা জিনিস খাওয়াবো.

আপনাকে।

—জিনিসটা কী তা-ই বলো না?

সুশীলা তবু ডান হাতটা মুঠো করে থাকে। বলে, আগে হাঁ করুন, তারপর নিজেই বুঝতে পারবেন। ভয় নেই, আমি বিষ খাওয়াবো না, আপনি হাঁ করুন—শেষ পর্যন্ত অনিলা হাঁ করল। আর সঙ্গে-সঙ্গে সুশীলা ডান হাতের মুঠোর জিনিষটা পুরে দিলে অনিলার মুখে।

অনিলা জিনিসটা খেয়ে বুঝতে পারে, পান। পানের খিলি একটা।

পান চিবোতে-চিবোতে অনিলা বলে, পান কোথায় পেলে তুমি?

সুশীলা বললে, শুধু পান কেন, জেলখানায় আপনি যা চাইবেন তাই-ই জোগাড় করে দিতে পারি আপনাকে। এখানে কোনও জিনিসের অভাব নেই। এ শুধু নামেই জেলখানা। শুধু বাইরে বেরোন যায় না, এইটেই একটা অসুবিধে।

কেন যে সুশীলা এই আট বছর ধরে তাকে এত খাতির-যত্ন করে এসেছে, তা অনিলা বুঝতে পারেনি। মনে আছে, কোর্টে যখন প্রথম সে জজসাহেবের রায় শুনেছিল তখন প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার অবস্থাই হয়েছিল তার। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সারাটা জীবন জেলখানায় কাটাতে হবে, এ যেন কল্পনাও করতে পারেনি সে।

কিন্তু না, পরে শুনেছিল সারা জীবন মানে চোদ্দটা বছর। তা চোদ্দটা বছরও কি কিছু কম? তখন সে যে বুড়ি হয়ে যাবে। তখন আর জীবনের বাকিটা কী থাকবে। প্রথমেই মনে পড়ল সুমন্তর কথা।

কত কষ্ট করে সুমন্তকে মানুষ করেছে সে। সব ছেলেদের মানুষ করা কষ্টের। টাকার কষ্টটা বড় কথা নয়। হেমন্ত বিশ্বাস যার শ্বশুর তার টাকার কষ্ট হবার কথা নয়। কুসুমগঞ্জের মানুষেরা সবাই জানতো, বিশ্বাস-বাড়িতে টাকার অভাব নেই। দারিদ্র্যের জন্যে কেউ মানুষ হতে পারবে না, বিশ্বাস বাড়িতে এ-ঘটনা ঘটা অসম্ভব।

বরং উল্টোটাই সত্যি। শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাস মশায় খুব ভালোবাসতো অনিলাকে। বলতো, বউমা, তুমি একটু বসন্তকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সংসারী করে তুলতে পারো না?

সত্যিই বসন্ত ছিল অন্য ধাতুর মানুষ। বৌভাতের দিনেই সেকথা বুঝতে পেরেছিল অনিলা। সেই গয়না পরা নিয়েই শুরু হয়েছিল। প্রথমে বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি। ছেলে বাবার মহাজনী ব্যবসাই পছন্দ করতো না। ওই মহাজনী কারবারের ওপরেই বসন্তের ছিল যত রাগ।

হেমন্ত বিশ্বাস সেটা জানতো। তাই ছেলের জন্যে এমন একটি বউ খুঁজতে আরম্ভ করেছিল, যে সুন্দরী। যৌতুকের দরকার নেই, দেনাপাওনার দরকার নেই, বংশ-গৌরব থাকুক বা না থাকুক, তা জানবারও দরকার নেই। শুধু কনে রূপসী হলেই চলবে।

হেমন্ত বিশ্বাস অনেক পাত্রী দেখেছিল। ঘটকও লাগিয়েছিল অনেকগুলো। পাত্রী শুধু সুন্দর হওয়া চাই। তাও আবার যেমন-তেমন সুন্দরী নয়। ডাকসাইটে সেরা সুন্দরী। যেন বউ দেখে লোকে বলে, হ্যাঁ বিশ্বাস মশাই বউ করেছে বটে, যেন ডানা-কাটা পরী।

এখন অবশ্য অনিলার আর সে-রূপ নেই। জেলখানার লপ্‌সি খেয়ে-খেয়ে সে রূপ নষ্ট হয়ে গেছে।

তবু সুশীলা বলতো, এমন রূপ কোথা থেকে পেলেন দিদি ?

অনিলা মনে-মনে হাসতো। হ্যাঁ, এমন রূপ না পেলেই হয়তো তার জীবনে অন্তত আর কিছু না হোক শান্তি আসতো। তার মা বিয়ের পর থেকে সারা জীবন বিধবা হয়ে কাটিয়েছে। মা'রও রূপ ছিল, কিন্তু অনিলার তুলনায় তা কিছুই নয়। হয়ত তার বাবা ছিল রূপবান পুরুষ। বাবাকে জন্মে ইস্তক দেখেনি। কিন্তু মাকে দেখেছে। মা-ও হয়তো তার বয়েসে রূপসী ছিল। তবে অম্বলের রোগে মা শেষের দিকে একেবারে কালচে হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর ছিল মাসির বাড়ির গলগ্রহ। ভাবনায়-চিন্তায় মার রোগ শেষের দিকে আরো বেড়ে গিয়েছিল। মেয়ের বিয়ে যখন পাকা হলো তখন মার মুখে প্রথম হাসি বেরোল। মা গিয়ে মঙ্গল চণ্ডীতলায় পুজো দিয়ে এল।

বললে, এতদিন পরে মা তবু মুখ তুলে চাইলে।

হ্যাঁ, মুখ তুলে চাইলোই বটে। এমনই মুখ তুলে চাইল যে, একদিন খুনের আসামী হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো।

কিন্তু ভাগ্যিস মা তখন বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে হয়তো মা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হতো, কিংবা দম আটকে মারা যেত !

অনেক দিন জেলখানার ভেতর যখন রাত্রে ঘুম আসতো না তখন মাকে উদ্দেশ্য করে বলতো, মা, তুমি আমায় ক্ষমা করো মা, আমি যা কিছু করেছি আমার সুমন্তর কথা ভেবে করেছি। তুমি কি চাও মা, যে আমার সুমন্ত পথের ভিখিরি হোক, পথে-পথে পেটের দায়ে সে ভিক্ষে করে বেড়াক ?

সকালবেলা সুশীলা যথারীতি আসতো। অনিলার চেহারা দেখে সে অবাক হয়ে যেত। বলতো, কী হলো দিদি, আপনার কি রাতে ঘুম হয়নি ?

অনিলা বলতো, না, তুমি কিছু ভেবো না, আমার ঘুম হয়েছে।

—না দিদি, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, নিশ্চয়ই আপনার ঘুম হয়নি, চলুন আজকেই আপনাকে আমি ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাবো ডাক্তারবাবুকে খুব ভালো ওষুধ দিতে বলবো।

অনিলা মাথা নাড়তো—ও কিছু না, তুমি ভুল দেখছো।

সুশীলা তবু ছাড়তো না। জোর করে অনিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যেত। জেলখানার হাসপাতাল, নামেই শুধু হাসপাতাল। যেমন সেখানকার ডাক্তার, তেমনি সেখানকার ওষুধ। সে ডাক্তার মন দিয়ে কারোর চিকিৎসাও করে না, আর সেই জল-মেশানো ওষুধে কারো রোগও সারে না।

অনিলা ঘরের ভেতরে এসে লুকিয়ে-লুকিয়ে সে-ওষুধ না খেয়ে নর্দমায় ঢেলে দিত। সুশীলা সে-সব জানতেও পারতো না !

অনিলা মনে মনে ভাবতো, কোথায় কত দূরে কোন্ কুসুমগঞ্জে পড়ে রইল তার নিজের ছেলে সুমন্ত। আর কোথায় জেলখানার ভেতরে কোন এক অচেনা মানুষ তাকে নিজের করে নিয়েছে। এরই নাম বোধহয় ভালোবাসা ! ভালোবাসার দেবতা সত্যিই অন্ধ।

আলমারির পাল্লা দুটো চাবি দিয়ে খুলে দিলে। বললে, এর ভেতরে ওই কঙ্কালগুলো রাখো।

কঙ্কাল! কথাটা অনিলার এখনও মনে আছে। ওগুলো নাকি মানুষের কঙ্কাল! অনিলাকে একটু দ্বিধা করতে দেখে বসন্ত বললে, ওই প্রত্যেকটা গয়না অন্য লোকেদের। ওগুলো অভাবের সময় তারা বাবার কাছে বাঁধা রেখেছিল, কিন্তু আর ছাড়িয়ে নেবার সুযোগ পায়নি। ওদের সঙ্গে তাদের অভিশাপ আর দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে আছে। তুমি যদি ওগুলো কখনও পরো, তা হলে সে অভিশাপ আর সেই দীর্ঘশ্বাস তোমার গায়েও লাগবে। যা বলছি, তুমি বুঝতে পারছো?

অনিলা মাথা নাড়লে। বললে, হ্যাঁ।

অনিলা নিঃশব্দে সব গয়নাগুলো বসন্তর হাতে দিলে। তারপর বসন্ত সেগুলো কোথায় রাখলে আবছা আলোয় তা আর দেখা গেল না।

তারপর আলমারিটা তালা বন্ধ করে দিয়ে বসন্ত বললে—এবার শুয়ে পড়ো, সারাদিন তোমার খাটুনি গেছে।

অনিলা আর কিছু না বলে বিছানার এককোণে গিয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে শুয়ে পড়লো।

সুশীলা সেদিন আবার এল। বললে, কাল রাত্তিরে কিছু শব্দ শুনেছিলেন দিদি? খুব হৈ-চৈ শব্দ?

—কীসের শব্দ?

সুশীলা বললে, কাল একজন গুন্ডা খুনীর ফাঁসি হয়ে গেল। সে খুব কান্নাকাটি করেছে। সবাই টের পেয়েছিল। আপনি টের পাননি?

অনিলা বললে, পেয়েছিলাম, কিন্তু কেন কীসের হৈ-চৈ হচ্ছে তা বুঝতে পারিনি। কী করেছিল সে? কেন ফাঁসি হলো তার?

—সে নিজের বউকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল।

—বিষ?

সুশীলা বললে, হ্যাঁ, বিষ!

—কেন, তাব বউ কী করেছিল?

সুশীলা বললে, তার বউটা বুঝি কোন্ পর-পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি তো বলি দিদি সে বেশ করেছে খুন করেছে। বউটা যেমন পাজি, তেমনি শাস্তি হয়েছে। হবে না? কী বলুন দিদি, তোর এত কুট্‌কুটানি যে তুই নিজের সোয়ামীকে ছেড়ে, ছেলেমেয়েদের ছেড়ে পরের সঙ্গে পালালি?

সুশীলা আরো কত কী বলে গেল, কিন্তু অনিলা কোনও মন্তব্য করলে না।

কথাটা শোনবার পর থেকেই সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অনেক পুরনো কথা মনে পড়তে লাগলো তার। জীবনটা যে কেমন করে কোথা দিয়ে তার কেটে গেল তাই-ই সে কেবল ভাবতো। সব মানুষের জীবনই কি এমনি? সকলের জীবনেই কি এত অশান্তি? তারও তো ফাঁসি হয়ে যেতে পারতো! যদি ফাঁসি হতো

তা'হলে সেও কি অমনি করে ফাঁসির আগে ভয়ে কান্নাকাটি করতো? প্রাণের ভয়ে হৈ-চৈ করতো? কে জানে—হয়তো করতো? কিংবা হয়তো করতো না।
আসলে জজসাহেবের মনে বোধহয় তাকে দেখে একটু দয়া হয়েছিল। কী দেখে দয়া হয়েছিল। তার রূপ দেখে না তার বৈধব্য দেখে! বিধবা হওয়া কি লোকের কাছে করুণার পাত্রী হওয়া?

বিয়ের পর একবার বাপের বাড়ি যেতে হয়। মাসিমা তাকে খুব আদর করেছিল সেদিন। মা-ও অসুস্থ শরীর নিয়ে মেয়েকে দেখে খুব খুশী হয়েছিল। মাসি জিজ্ঞেস করেছিল, কী রে, তোর অত গয়না দেখে এলুম, সেগুলো কোথায়? সেগুলো পরে আসিসনি যে? সে-সব কোথায় গেল?
অনিলা কী আর বলবে। চুপ করে রইল।
শুধু বললে, উনি গয়না পরা মোটেই পছন্দ করেন না।
—ওমা, সে কি? মেয়েমানুষ গয়না পরবে না?
অনিলা বললে, উনি বলেন একদিনের জন্যে বাপের বাড়ি যাচ্ছো, অত গয়না পরার কী দরকার?
মা আড়ালে ডেকে নিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে, জামাই তোকে আদর করে?
অনিলা সে-কথার জবাব দেয়নি। মা বললেন, বল না, বল আমাকে। আমার জেনেও সুখ। জামাই আদর করে তো?
তবু কিছু জবাব দেয়নি অনিলা।
মা আবার বলেছিল, আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না রে। যাবার আগে আমি জেনে যেতুম যে তুই সুখী হয়েছিস! তুই ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই, কিছু নেই। জামাই তোকে ভালোবেসেছে জানতে পারলে আমি মরলেও সুখে মরবো। মা'র সামনে লজ্জা করতে নেই, বল মা আমাকে, বল তুই।
অনিলা মুখটা নিচু করে বললে, হ্যাঁ—
মা বললে, যাক্, বাঁচলুম মা, তোর কথা শুনে বাঁচলুম। এখন আমার মরতেও আর কোনও আপত্তি নেই। তুই ছিলি আমার গলার কাঁটা। তোর যখন একটা গতি হয়েছে তখন ভগবান আমার সাধ মিটিয়ে দিয়েছেন, আর আমার কোনও সাধ অপূর্ণ নেই।
তা ভালোই হয়েছে এখন মা বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে তাকে দেখে যেতে হতো যে তার মেয়ে এখন খুনের দায়ে জেল খাটছে। আর শুধু মা-ই বা কেন, মাসি আর মেসোমশাইও নেই যে তার বদনামে তাদের মুখ পুড়বে। তারা চলে যাবার আগে সবাই-ই জেনে গেছে যে, অনিলা ভালো পাত্রের হাতে পড়েছে।

মনে আছে, একদিন বসন্ত আর হেমন্ত বিশ্বাসের মধ্যে খুব ঝগড়া বেঁধে গেল। অনিলা ভেতর বাড়িতে ছিল। দু'জনের কথাবার্তা কানে এল তার। শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বউমা'র সব গয়নাগুলো তো তোমার কাছেই আছে!

বসন্ত বললে, আমার কাছে আপনার কোনও গয়না নেই!

—সে কি? কী বলছো তুমি? ফুলশয্যার দিন তো সব গয়নাই বউমার গায়ে পরানো হয়েছিল, তারপর কোথায় গেল?

—সে আপনার বউমাই জানে। সে-গয়নার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনার বউমাকেই জিজ্ঞেস করুন।

—ঠিক আছে আমি বউমাকে জিজ্ঞেস করছি—বলে হেমন্ত বিশ্বাস ডাকতে লাগলো, বউমা, বউমা এদিকে একবার এসো তো বউমা—

তখন মাত্র চারদিন হলো বিয়ে হয়েছে অনিলার। আর আগের দিন রাত্রে মাত্র ফুলশয্যা হয়েছে। শ্বশুরের সামনে যেতে লজ্জা করছিল অনিলার। তবু লজ্জার মাথা খেয়ে অনিলা মাথার ওপর লম্বা ঘোমটা তুলে দিয়ে দাঁড়ালো গিয়ে শ্বশুরের সামনে।

অনিলা যেতেই হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ বউমা, কাল যে গয়নাগুলো তোমাকে পরতে দিয়েছিলুম, সেগুলো কোথায় গেল?

অনিলা মহা মুশকিলে পড়লো। কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। একদিকে শ্বশুর দাঁড়িয়ে আর একদিকে স্বামী বসন্ত। যদি বলে যে গয়নাগুলো সে স্বামীকে দিয়েছে, তাহ'লে শ্বশুর স্বামীকেই চেপে ধরবে।

শ্বশুর জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি শুতে যাবার আগে গয়নাগুলো খুলে কোথাও রেখেছিলে, না গয়নাগুলো পরেই শুতে গিয়েছিলে?

অনিলা থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতেই বললে, আমার তো মনে পড়ছে না ঠিক—

শ্বশুর বললে, সে কি, এই তো কালকের রাতের ঘটনা, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? এত ভুলো মন কেন তোমার? কিন্তু এত ভুলো মন হলে তো চলবে না বউমা। একটু মনে করে দেখো সেগুলো কোথায় রেখেছ। ও-সব গয়নার তো হিসেব রাখতে হবে আমাকে।

অনিলা এ-কথার জবাবে কিছুই বললে না। ঘোমটার আড়ালে শুধু মুখ ঢেকে কাঠের পুতুলের মত সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

হেমন্ত বিশ্বাস তাকে লক্ষ্য করে আবার বলতে লাগলো, এ বাড়িতে তোমার শাশুড়ি নেই। তার মানে তুমিই এ-বাড়ির গিন্নী হলে। এ-বাড়ির সব কিছুর হিসেব এখন থেকে তোমাকেই রাখতে হবে। শুধু গয়নাই নয়, চাল-ডাল-তেল-নুন-মশলা সব কিছুর হিসেব। আমি পুরুষমানুষ, আমি আমার মহাজনী ব্যবসা নিয়ে সারা দিন-রাত ব্যস্ত থাকবো। বাড়ির ভেতরে অন্দর মহলে কী ঘটছে, তা

দেখবার-শোনবার সময় হবে না আমার। আর বসন্ত, তোমার স্বামী, ওর দ্বারা কিছুু হবে না। ওর ওপরে আমার কোনও ভরসাই নেই। ও শুধু লেখা-পড়া নিয়েই থেকেছে এতদিন। কোথা দিয়ে কেমন করে সংসার চলছে, কোথা থেকে টাকা আসছে, ও তার কিছুই খবর রাখে না। ও শুধু জানে বই আর বই। তোমাকে আমি গরীব ঘর থেকে তোমার রূপ দেখে এনেছি। তোমার কাজ ওই বসন্তকে তুমি সংসারী করে তুলবে, যাতে সংসারে ওর মন বসে সেই চেষ্টা করবে। তাই বলছি এত ভুলো মন হলে তোমার তো চলবে না বউমা। সব গয়নাগুলো কোথায় রাখলে মনে করতে চেষ্টা করো, আমি জানতে চাই।

অনিলা তেমনি মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

বসন্তও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হেমন্ত বিশ্বাস তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী রে, তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস? বউমা যখন তোর ঘরে ঢুকলো তখন তুইও তো সেখানে ছিলি, তুইও দেখিসনি বউমা গয়নাগুলো গায়ে পরে শুলো না খুলে শুলো? গয়না পরে যদি শুতো, তাহ'লে তো সকালবেলায়ও সেগুলো গায়ে পরা থাকতো। কিন্তু সেগুলো যখন গায়ে নেই তখন নিশ্চয়ই খুলে শুয়েছে। খুলে কোথায় রাখলো দেখিসনি তুই?

বসন্ত বললে, না, আমি দেখিনি।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তাহ'লে কি গয়নাগুলো উড়ে গেল ঘর থেকে? গয়না-গুলোর কি পাখা আছে যে ঘর থেকে উড়ে যাবে? না কি ঘরের ভেতরে চোর লুকিয়ে ছিল, সে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো, তা উড়েই যাক আর চোরে চুরি করে নিয়েই যাক, ও গয়নাগুলো আমার চাই। এই তোকে আমি বলে রাখলুম। ও তোর শ্বশুরবাড়ির দেওয়া গয়না নয়। ও আমার বন্ধকী গয়না। দেনাদারদের গয়না। আমি তো ওই গয়না দিয়ে বউমাকে সাজিয়ে দিয়েছিলাম পাছে লোকে নিন্দে করে তাই। কিন্তু তাই বলে কি হারিয়ে যাবে? টাকা কি অত সস্তা? টাকা উপায় করতে গায়ের রক্ত জল হয় না?

হেমন্ত বিশ্বাস বোধহয় আরো অনেক কিছু বলতো। কিন্তু বাইরে থেকে কে একজন ডাকতে এল। কোনও দেনাদার হয়তো দেখা করতে এসেছে। তাকে বললে, বল্, বসতে, আমি যাচ্ছি।

লোকটা চলে গেল।

হেমন্ত বিশ্বাস যেতে যেতেও বললে, তোমাদের দু'জনকেই বলছি, ও গয়না আমার চাই। যেমন করে হোক ও-গয়না আমাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। আমার সব সম্পত্তি একদিন তোমরাই পাবে। আমি শ্মশানে নিয়ে যাবো না ও সব, আমি মরবার পর তখন তোমরা আমার টাকা উড়িয়েই দাও আর বেচেই দাও, কি দান করে দাও আমি তখন তা দেখতে আসছি না। কিন্তু এখন আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া চাই—

বলে হেমন্ত বিশ্বাস আর দাঁড়াল না, সোজা আবার বাইরের দিকে চলে গেল। তার সকাল থেকে অনেক কাজ। তার কাছে অনেক লোক অনেক আর্জি নিয়ে আসে।

আনা হয়েছে। সেই জন্যেই তুমি আমাকে বলছো!
অনিলা বললে—কেউ কি কাউকে জোর করে সংসারী করতে পারে?
বসন্ত বললে—তুমি আমাকে তোমার রূপ দেখিয়ে সেই চেষ্টা করো না!
অনিলা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, তার চেয়ে গয়নাগুলো দিয়ে দাও, আমি বাবাকে দিয়ে দিই। বাবার কাছে দেওয়াই ভালো।
বসন্ত বোধহয় ব্যস্ত ছিল খুব। পকেট থেকে চাবি বার করে অনিলার দিকে এগিয়ে দিলে। বললে, এই নাও, গয়নাগুলো আলমারির ভেতরে রেখে দিয়েছি, সেগুলো নিয়ে বাবাকে দিতে পারো।
তারপর একটু থেমে বললে, কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, ওগুলো আমারও নয়, তোমারও নয়, এমন কি বাবারও নয়। ওগুলো আমাদেরই গ্রামের গরীব লোকদের রক্ত-জল-করা পয়সায় কেনা। ওগুলো গায়ে পরে তুমি স্বর্গে যাবে না।
বলে বাইরে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু অনিলা বললে, একটু দাঁড়াও—
বসন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, কী?
অনিলা বললে, এগুলো নিয়ে তবে যাও—
বলে আলমারি খুলে সব গয়নাগুলো স্বামীর হাতে দিলে।
বসন্ত বললে—এগুলো নিয়ে আমি কী করবো?
অনিলা বললে—যাঁর জিনিস তাঁকে দিও।
—এগুলো কার জিনিস?
অনিলা বললে—ওই যে তুমি বললে, যাদের জিনিস তাদের। গ্রামের যে-গরীব লোকদের রক্ত-জল-করা পয়সায় কেনা, তাদের।
বসন্ত গয়নাগুলো হাতে করে নিয়ে খানিকক্ষণ স্থানুর মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে, তুমি তো বলেই খালাস, কিন্তু জানো না, এগুলো বাবার বুকের এক-একখানা পাঁজরা। এই একটা পাঁজরার যদি হিসেব না মেলে তাহ'লে বাবা মুখে রক্ত উঠে মারা যাবে।
অনিলা বললে, তার মানে?
—তার মানে এগুলো হারিয়ে গেলে বাবাকে আর বাঁচানো যাবে না। এগুলো তোমাকে পরানো হয়েছিল একরাত্রির জন্যে। আর তুমি ছিলে একদিনের রাণী। এগুলো বাবাকে ফিরিয়ে দিলে আবার এগুলো বাবার সিন্দুকে গিয়ে জমবে!
—তা সিন্দুকে গিয়ে জমলে ক্ষতি কী?
বসন্ত বললে—ক্ষতি বাবার কিছুই নেই, ক্ষতি সেইসব লোকদের যাদের রক্ত দিয়ে কেনা ওই জিনিসগুলো। তুমি জানো কিনা জানি না, এই কুসুমগঞ্জে বেশির ভাগ লোকই গরীব। এদের যথা-সর্বস্ব ওই গয়নাগুলোই। দরকারে-অদরকারে ওগুলো কেমন এক কায়দায় একদিন বাবার কাছেই পিছলে চলে আসে, তারপরে আর তারা আসল মালিকের কাছে ফিরে যায় না।
অনিলা বললে, তবু এগুলো যখন এখন বাবার সম্পত্তি, তখন বাবার কাছেই এগুলো চলে যাওয়া উচিত।
বসন্ত বললে, আইনতঃ তাই-ই হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক বেআইনী কাজকেও আইনী বলে চালানো হয়। সেটা আমি মনে করি ভালো

নয়।
বসন্ত এর পরে আর দাঁড়ালো না। বললে, আমি এখন চলি—
বলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেল।
বারবাড়ি থেকে হেমন্ত বিশ্বাস কাজের পর এসে ডাকলো, বউমা—
অনিলা মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ালো শ্বশুরের সামনে। হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, কী বউমা, খুঁজে পেলে?
অনিলা বললে—হ্যাঁ বাবা, পেয়েছি।
—কোথায় ছিল?
গয়নাগুলো হাতে পেয়ে হেমন্ত বিশ্বাসের মুখে যেন হাসি ফিরে এল। বললে, জানো বউমা, এর অনেক দাম। এইগুলো আছে বলেই এখনও আমার বুকে বল আছে। নইলে কবে মরে যেতুম। তা এগুলো কোথায় রেখেছিলে তুমি?
অনিলা বললে, আমি রাখিনি—
—তাহ'লে বসন্ত রেখেছিল বুঝি? ও এক অদ্ভুত ছেলে হয়েছে। আমার টাকা-পয়সার দিকে মোটে নজর নেই। তুমিই বলো, টাকা-পয়সা কি ফ্যালনা জিনিস? এই টাকা-পয়সা আছে বলেই তো এখনও আমার সংসার চলছে। তুমি তো গরীবের মেয়ে, গরীব হওয়ার দুঃখ-কষ্ট তুমি যেমন বুঝবে, বসন্ত তেমন বুঝবে না। তাই তো তোমাকে বউ করে এনেছি। তুমি একটু বসন্তকে বুঝিয়ে বলবে, বুঝলে? বলবে টাকা-পয়সার এত হ্যালা-ফ্যালা ভালো নয়। টাকা আছে বলেই সংসার চলছে, নইলে কবে সব কিছু উল্টে-পাল্টে যেত। বসন্ত কিছুছু বোঝে না। বরাবর কলকাতায় গিয়ে থেকেছে তো, আর আমিও ওকে মাসে মাসে মোটা টাকা পাঠিয়েছি। কাকে বলে টাকার অভাব তা ও জানে না। তাই ওকে আমি বলেছি, টাকাকে তুই এত হ্যালা-ফ্যালা করিস এটা ভালো নয়, তাহলে টাকাও একদিন তোকে হ্যালা-ফ্যালা করবে। টাকা হলো গিয়ে লক্ষ্মী। টাকাকে অত অবহেলা করলে লক্ষ্মীকেও অবহেলা করা হয়। কী বলো বউমা, আমি ঠিক কথা বলিনি?
অনিলা নতুন বউ। সে আর কী বলবে? সে শুধু শ্বশুরের কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছিল।

বিয়ের কিছুদিন বাদেই অনিলা বুঝতে পেরেছিল যে তার স্বামী অন্য ধাতের মানুষ। হেমন্ত বিশ্বাস ছেলের সম্বন্ধে যা বলেছিল, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়।
একদিন অনেক রাত্রে বাড়ি এল বসন্ত। অনিলা জিজ্ঞেস করলে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে?
বসন্ত বললে—একটা কাজ ছিল।
অনিলা সে-জবাবে খুশী হয়নি। জিজ্ঞেস করেছিল, কী এত কাজ থাকে তোমার রোজ? কোথায় যাও তুমি?
বসন্ত বলেছিল—সে তুমি বুঝবে না।

অনিলা বলেছিল—তুমি যদি বুঝিয়ে বলো তো কেন বুঝবো না ?
বসন্ত বলেছিল—তোমাকে বোঝাবার মত এখন সময় নেই আমার।
অনিলা বলেছিল, আজ সময় না থাক কিন্তু অন্য কোনও দিন বুঝিয়ে বোলো। তোমার তো বাড়ি ফিরতে রোজই রাত হয়।
বসন্ত বলেছিল—আমার এমনি রোজই রাত হবে। পুরুষমানুষের কাজ থাকেই, তা বলে তোমার কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে নাকি ?
অনিলা বলেছিল—না, বাবা জিজ্ঞেস করছিলেন তাই বলছি।
বসন্ত বলেছিল—বাবার কথায় কান দিও না। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিও।
অনিলা বলেছিল—তুমি সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকো, তুমি বাবার কথা না শুনলেও পারো। কিন্তু আমাকে তো সারাদিন বাড়ি থাকতে হয়, আমি না শুনে কী করে থাকি বলো ?
বসন্ত বলেছিল—তুমি চুপ করে থাকবে।
অনিলা বলেছিল—বাবার কথায় চুপ করে থাকা যায় ?
বসন্ত বলেছিল—না চুপ করে থাকতে পারো তো বলবে তুমি জানো না।
অনিলা বলেছিল, নিজের স্বামীর ব্যাপার স্ত্রী হয়ে জানি না বললে, তিনি কী ভাববেন বলো তো। আমাকে তো বলেই দিয়েছেন তোমাকে সংসারী করবার জন্যেই আমাকে এ-বাড়িতে আনা।
বসন্ত বলেছিল, আমি বুঝি ছেলেমানুষ যে আমাকে তুমি সংসারী করবে ? সংসার কাকে বলে আমি কি তা জানি না ?
বসন্ত আবার বললে, আমি সংসার না করেও সংসারের সব বুঝি। বাবার কাছে যার নাম সংসার, আমার কাছে তা অত্যাচার।
—অত্যাচার ? অত্যাচার মানে ?
বসন্ত বলেছিল—বাবা চায় গাঁয়ের লোকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করতে। আমি জীবনে তা পারবো না। ওকেই যদি সংসার করা বলে তাহ'লে তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমাকে সে-রকম সংসারী করতে পারবে না।
অনিলা বলেছিল, তা যদি না পারবে তো আমাকে কেন বিয়ে করে এ-বাড়িতে আনলে ?
বসন্ত বলেছিল—গরীবদের অত্যাচার না করেও সংসার করা যায়।
অনিলা বলেছিল—তাহ'লে সেই রকম সংসারই তুমি করো না দেখি।
বসন্ত বলেছিল—তাহ'লে বলো এ-বাড়ি ছেড়ে তুমি আমার সঙ্গে অন্য কোথাও, অন্য কোনও বাড়িতে চলে যাবে ?
—আর বাবা ?
—বাবা তাঁর টাকা-পয়সা জমি-জমা নিয়ে এ-বাড়িতে থাকুন।
অনিলা বলেছিল, তাহ'লে এই বয়েসে কে তাঁকে দেখবে ? কে তাঁকে ঠিক সময়ে ভাত রান্না করে দেবে ?
বসন্ত বলেছিল—বাবার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তাঁর অনেক টাকা-কড়ি আছে, তিনি একটা মাইনে-করা লোক দিয়ে সব করিয়ে নেবেন।

—আর বাবার টাকা ?

—বাবার টাকার কথা বাবাই ভালো বুঝবেন।

অনিলা বলেছিল, কিন্তু তুমি তো চাকরিও করো না, ব্যবসাও করো না, তোমার চলবে কী করে ?

—ভাবছো তোমাকে ঠিকমত খাওয়াতে-পরাতে পারবো কিনা ?

অনিলা বলেছিল, তুমি কি চাকরি করবে ?

—সে আমি কি করবো না-করবো আমি বুঝবো। তুমি আমার সঙ্গে এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি কিনা তাই বলো আগে।

অনিলা বলেছিল—তোমার সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয়েছে, তখন তুমি যেখানে যেতে বলবে আমি সেখানেই যাবো।

বসন্ত বলেছিল—ঠিক আছে, আমি তাহ'লে সেই ব্যবস্থাই করবো। মোট কথা আমার এ বাড়িতে থাকতে ঘেন্না করে।

অনিলা জিজ্ঞেস করেছিল, কেন বলো তো ? এ বাড়ি কী দোষ করলো ?

বসন্ত বলেছিল—সে তুমি মেয়েমানুষ, বুঝবে না। তুমি তো বাইরে বেরোও না। বাইরে বেরোলে বুঝতে পারবে বাবাকে কেউ দেখতে পারে কি না।

—দেখতে পারে না মানে ?

বসন্ত বলেছিল—তুমি জানো না, বাবাকে আশপাশের গ্রামের সব লোকই সুদখোর বলে গালাগালি দেয়। এই আমাদের যে বাড়ি দেখছো, এর সমস্ত কিছু সুদের টাকায় তৈরি। এর প্রত্যেকটা ইঁটে গরীব লোকদের রক্ত লেগে আছে।

—তা সুদ নেওয়া কি দোষের ?

বসন্ত বলেছিল—সুদ নেওয়া দোষের নয় তো কি সম্মানের ?

—শুনেছি ব্যাঙ্কও তো সুদ নেয় !

বসন্ত বলেছিল, তুমি ব্যাঙ্কের সঙ্গে বাবার তুলনা করছো ? ব্যাঙ্ক যে সুদ নেয়, বাবা নেয় তার হাজার গুণ। এ সুদ নেওয়া নয়, রক্ত চোষা। জমি-জমা, গয়না বাঁধা রেখে তারা অভাবের সময় টাকা নেয় বাবার কাছ থেকে। কিন্তু কোনও দিনই তারা সেই জমি-জমা গয়না ফেরত নিতে পারে না। এত চড়া সুদ বাবার ব্যবসায়। বাবার জন্যে যে কত লোক ধনে-প্রাণে ফতুর হয়ে গেছে, তার ঠিকানা নেই। তারা যদি কোনও দিন পারে তো বাবার মাথাটা কেটে ফেলতে পারে, এত তাদের রাগ বাবার ওপর।

কথা বেশি দূর এগোয়নি। তার মধ্যেই বসন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। বড় ক্লান্ত থাকতো সে। মাঝে-মাঝে কয়েকদিন বাড়িতেই আসতো না। আবার হয়তো একদিন হুট্ করে হঠাৎ বাড়িতে এসে হাজির হতো।

অনিলা যথারীতি জিজ্ঞেস করতো, এতদিন কোথায় ছিলে ?

বসন্ত অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিত। বলতো, একটা কাজের চেষ্টা করছি কলকাতায়।

অনিলা মনে করতো বসন্ত এ-বাড়ি ছেড়ে অন্য কোনও আস্তানার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত।

ছেলে বাড়ি এলে হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করতো, এতদিন কোথায় ছিলি বাড়ি

ছেড়ে ?
বসন্ত বলতো, একটা কাজের চেষ্টা করছি।
হেমন্ত বিশ্বাস বলতো—কী কাজ ?
বসন্ত বলতো—যে-কোনও একটা কাজ। বিয়ে করেছি, কাজের চেষ্টা তো করতে হবে।
হেমন্ত বিশ্বাস বলতো—তার মানে ? তুমি কী রোজগার করে বউকে খাওয়াবে মতলব কবছো ?
বসন্ত জবাব দিত না। হেমন্ত বিশ্বাস বলতো, ওসব বদ মতলব ছাড়ো। তোমাকে কোনও কাজের চেষ্টা করতে হবে না। আমি যে কাজ করছি, সেই কাজই বরং তুমি করো, এখন থেকে সে-কাজ শিখে নাও। আমার বয়েস হচ্ছে, একদিন তোমাকেই এ-কারবার করতে হবে। এখন থেকে এসব দেখে শুনে নাও তুমি।
বসন্ত বলতো, আমি কলকাতায় কাজের চেষ্টা করছি।
যেন আকাশ থেকে পড়তো হেমন্ত বিশ্বাস। বলতো, কলকাতায় ? কাজের চেষ্টা করছো ? তাহ'লে বউমা ? বউমাও কি কলকাতায় থাকবে ? তাহ'লে এখানকার আমার এত জমি-জমা-ক্ষেত-খামার, সম্পত্তি, এসব ? এসব কাকে দিয়ে যাবো ?
বসন্ত বলতো—তা আমি জানি না।
হেমন্ত বিশ্বাস বলতো—তাহ'লে এতদিন আমি এত সম্পত্তি কার জন্যে করেছি ? আমার নিজের জন্যে ? আমার একলার জন্যে ক'টা টাকার দরকার হয় ? তোমরা যাতে পুরুষানুক্রমে এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারো সেই জন্যেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছি। তা সেই তুমিই যদি এখানে না থাকো, তো আমি এতদিন কার জন্যে খাটলুম ?
কিন্তু এসব কথা বেশিক্ষণ বলার সুযোগ থাকতো না হেমন্ত বিশ্বাসের। কথা শেষ না হবার আগেই কেউ না কেউ এসে যেত, আর কথার মাঝখানে বাধা পড়তো। কাজ শেষ করে যখন সে আবার ছেলের সঙ্গে কথা বলতে আসতো তখন দেখতো বসন্ত নেই।
জিজ্ঞেস করতো, বসন্ত কোথায় গেল বউমা ?
অনিলা বলতো, তিনি তো নেই, এখুনি বেরিয়ে গেলেন।
—কখন ফিরে আসবে ?
অনিলা বলতো—তা তো বলে যায়নি বাবা !
এমনি করেই দিন কাটতো অনিলার। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকটা এই রকম ছিল। যখন নতুন বউ হয়ে এ-বাড়িতে এসেছিল সে তখন কত হিংসে করেছিল বাপের বাড়ির দেশের লোকেরা।
মাও বলেছিল, অনেক ভাগ্যি করলে অমন সোয়ামী-শ্বশুর পায় মা।
মাসিমা-মেসোমশাইও বলেছিল, অনিলার শ্বশুর-স্বামী ভাগ্যটা ভালো। একটা পয়সা লাগলো না অনিলার বিয়েতে, এমন তো দেখা যায় না।
কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, ততই অনিলা দেখলো যে এ এক অদ্ভুত বাড়ি। শ্বশুরের অগাধ টাকা, স্বামীও শিক্ষিত, বিদ্বান, রূপবান। কিন্তু বাপ-ছেলের মিল নেই মনের। স্বামী যে মাঝে-মাঝে কোথায় চলে যায় কে জানে। শুধু যাবার

সময় বলে যায় তার ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে।
এই রকম অবস্থাতেই একদিন সুমন্ত এল।
সুমন্ত! জেলখানার ভেতর তার কথা মনে পড়লেই অনিলার চোখ দু'টো জলে ভিজে আসতো। ছোটবেলায় ওই সুমন্ত কত দুষ্টু ছিল। হেমন্ত বিশ্বাস নাতির মুখ দেখলে একটা সোনার গিনি দিয়ে। যেন নিশ্চিন্ত হলো মনে-মনে। যখন হেমন্ত বিশ্বাস নিজের ঘরে কাজ করতে বসতো, তখন অনিলার কাছ থেকে তাকে নিয়ে যেত। বলতো, দাও বউমা, ওকে আমার কাছে দাও। ও আমার কাছে থাকলে দুষ্টুমি করবে না। বড় লক্ষ্মীছেলে আমার সুমন্ত।
হেমন্ত বিশ্বাস নাতির অন্নপ্রাশনে খুব ঘটা করলে। এলাহি ব্যবস্থা হলো বাড়িতে। অনিলার বিয়েতে যেমন ঘটা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি। লোকে আশীর্বাদ করে গেল প্রাণ ভরে। যার যা সাধ্য তাই দিয়ে আশীর্বাদ করলে। কেউ দিলে রুপোর টাকা, কেউ দিলে খেলনা, কেউ দিলে রেকাবিতে করে মিষ্টি। গ্রামের সাধারণ সব লোক, কারোরই তেমন আর্থিক সামর্থ্য নেই। কিন্তু মহাজন বলে কথা। মহাজনের কাছে সকলেরই টিকি বাঁধা। আশীর্বাদী না দিলে মহাজন অখুশী হবে। বলবে, কই ঘোষের পো. তুমি আমার নাতির অন্নপ্রাশনে কিছু উপুড়-হস্ত করোনি, এক পেট খেয়ে গিয়ে এখন কান্নাকাটি করে হাতে পায়ে ধরতে এসেছ?
লোকে বলতো, সোন্দর হবে না? বাপ-মা যেমন সোন্দর, ছেলেও তো তেমনি হবে গো।
মা দেখতে পায়নি তার নাতিকে। ওই একটি দুঃখ ছিল অনিলার। মা'র নিজের জীবনে কোনও সাধই পূর্ণ হয়নি। অনিলার ছেলে দেখবার বড় সাধ ছিল মার। কিন্তু কপালে যার সুখ লেখা নেই, তার সুখ কোথা থেকে হবে!
বাড়িতে রান্নাবান্নার জন্যে হেমন্ত বিশ্বাস গোড়া থেকেই লোক রেখেছিল। এবার নাতিকে দেখবার জন্যে আর একটা লোক রাখলো।
হেমন্ত বিশ্বাস যখন তার কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকতো, তখন বাড়ির ভেতর সুমন্তর কান্না শুনলেই সব কাজকর্ম ফেলে দৌড়ে আসতো। বলতো, সুমন্ত কাঁদে কেন বউমা? ওকে কাঁদাচ্ছে কেন ভোলার মা?
ভোলার মা ভাল লোক, সুমন্তকে থামাতে হিমসিম খেয়ে যেত।
সেখানে যারা বসে থাকতো তারা সুমন্তকে দেখে খোসামোদ করে বলতো, কর্তা, এই নাতি আপনার মুখ উজ্জ্বল করবে।
কথাগুলো শুনে খুব খুশী হতো হেমন্ত বিশ্বাস। এমনও হয়েছে যে, নাতিকে প্রশংসা করায় কয়েকটা পয়সা সুদ মকুব করে দিয়েছে।
কথায় বলে টাকার চেয়ে সুদ মিষ্টি, হেমন্ত বিশ্বাসেরও তাই হয়েছিল।—ছেলের চেয়ে নাতি মিষ্টি। সেই নাতিকে নিয়েই দিন কাটতো তার। শুধু রাতটা ছাড়া সব সময়েই দাদুর কাছে থাকতো সে। অত ব্যস্ত মানুষ, তার কাজের ক্ষতি হলেও নাতিকে সব জায়গায় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চাই। হাটে যাবে, সঙ্গে হাত ধরে নিয়ে যাবে নাতিকে। বলবে, দাদু, তুমি আমাকে বেশি ভালোবাসো, না তোমার বাবাকে?
নাতি বললে, তোমাকে।

হেমন্ত বিশ্বাস সকলকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতো, এই শোন, নাতি কী বলছে শোন, ও ওর বাবার চাইতে নাকি আমাকে বেশি ভালোবাসে !
লোকে বলতো, দেখতেও ঠিক আপনার মত হয়েছে কর্তাবাবু।
অনেকে বলতো, ওকেও কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন কর্তাবাবু, কুসুমগঞ্জে থাকলে ও আমাদের মত গোমুখ্যু হবে।
হেমন্ত বিশ্বাস বলতো, পাগল হয়েছ তোমরা, আমার খুব শিক্ষে হয়ে গিয়েছে বাপু, ওকে আর কলকাতায় পাঠাবো না। পাঠালেই বাপের মতন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যাবে। ওকে আমি ছোটবেলা থেকে আমার গদীতে বসাবো। ও হিসেব শিখুক, টাকা-আনা-পাই হিসেব করতে শিখলেই আমার কাজ চলে যাবে !
কিন্তু একেবারে লেখাপড়া না শিখলে চলে না। তাই হেমন্ত বিশ্বাস নিজেই হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে গৌর মাষ্টারের হাতে তুলে দিয়ে বললে, একে অংকটা ভালো করে শিখিয়ে দিও মাষ্টার, যাতে বড় হয়ে হিসেবটা ভালো কষতে পারে। তার বেশী আমার দরকার নেই।
বড় আদরের নাতি সুমন্ত দাদুর কাছে মানুষ হতে লাগলো। হেমন্ত বিশ্বাস তাকে পাশে নিয়ে কাজ-কর্ম করে। নাতি জিজ্ঞেস করে, এগুলো কী দাদু ?
হেমন্ত বিশ্বাস বলে, ওগুলো টাকা।
সুমন্ত তবু বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, এগুলো দিয়ে কী হয় দাদু ?
হেমন্ত বিশ্বাস বলে—এগুলো দিয়ে সব হয়। এ দিয়ে সব কিছু কেনা যায়।
—কী কেনা যায় ?
হেমন্ত বিশ্বাস বলে—চাল কেনা যায়, ডাল কেনা যায়, কাপড় কেনা যায়, সোনা-রুপো-গয়না-বাড়ি-ঘর সব কিছু করা যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী জিনিস হলো এই টাকা !
নাতি বায়না ধরে। বলে, আমাকে একটা টাকা দাও না দাদু !
হেমন্ত বিশ্বাস বলে—খবরদার, ওতে হাত দিতে নেই। হারিয়ে যাবে ! তখন আর কিছু কিনতে পারা যাবে না।
তাড়াতাড়ি ছড়ানো টাকাগুলো সামলায় হেমন্ত বিশ্বাস। ছোট ছেলেকে বিশ্বাস নেই।
তবু নাতি বায়না ধরে বলে, আমাকে একটা টাকা দাও দাদু।
হেমন্ত বিশ্বাস বলে—তুমি টাকা নিয়ে কী করবে ?
সুমন্ত বলে—আমি একটা পিস্তল কিনবো !
পিস্তল ! কথাটা শুনে সবাই ছেলেমানুষের বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যায়। এইটুকুন ছেলের এত বুদ্ধি ! খেলনা কিনবে না, খাবার কিনবে না, নারকোল নাড়ু কিনবে না, কিনবে কিনা পিস্তল !
সবাই জিজ্ঞেস করে, ও পিস্তলের নাম জানলে কী করে কর্তা ?
হেমন্ত বিশ্বাস নিজেও অবাক। বললে, হ্যাঁরে সুমন্ত, তুই পিস্তলের কথা জানলি কী করে রে ? পিস্তল দিয়ে তুই কী করবি ?
সুমন্ত বললে—আমি গুণ্ডাদের খুন করবো। পিস্তল দিয়ে মানুষ খুন করা যায়।
হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করে, কে বললে তোকে পিস্তল দিয়ে মানুষ খুন করা যায় ?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—বাবা।

হেমন্ত বিশ্বাসের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো! বসন্ত! বসন্ত পিস্তলের কথা বলেছে? সেই বা এসব কথা ছেলেকে বললে কেন?

এর পরে আর এ প্রসঙ্গ উঠলো না। টাকাকড়ি, দলিল-পত্র সব সিন্দুকের মধ্যে রেখে নাতির হাত ধরে হেমন্ত বিশ্বাস বাড়ির ভেতরে এল। ডাকলে, বউমা?

অনিলা রান্নাঘরে তখন রান্নায় ব্যস্ত ছিল। শ্বশুরের ডাক শুনে বাইরে এল। বউমা কাছে আসতেই হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে, বসন্ত কোথায় বউমা?

—তিনি তো বাড়ি নেই, তিনি কলকাতায় গেছেন!

—অত ঘন-ঘন সে কলকাতায় যায় কেন? সেখানে ওর অত কী কাজ থাকে তা তোমাকে বলে না?

অনিলা চুপ করে রইল। তারপর বললে, আমি জানি না।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—তুমি যদি নাই জানবে, তাহলে তোমাকে বউ করে এনেছি কেন এ বাড়িতে? তোমার রূপ দেখেই তো তোমাকে বসন্তর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলুম, যাতে ও সংসারী হয়। যাতে ও তোমার বশ হয়। আমি তো তোমাদের কাছ থেকে একটা পয়সাও নিইনি। আমি নিজেই আমার গাঁটের পয়সা খরচ করে ছেলের বিয়ে দিয়েছি। কেউ বলতে পারবে না, আমি সুদখোর বলে ছেলের বিয়েতে টাকা নিয়েছি!

এ-সব কথা হেমন্ত বিশ্বাসের এই প্রথম নয়। এ-সব কথা আগেও অনেক বার শুনতে হয়েছে অনিলাকে। সময়ে অসময়ে অনিলাকে শ্বশুরের কাছ থেকে এ-সব কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু সে কী করবে? বসন্ত যদি তার কথা না শোনে তো সে কী করতে পারে? কতবার তো সে-কথা সে বসন্তকে শুনিয়েছে। কিন্তু নিজের বাবা যাকে বশ করতে পারলে না, তাকে বশ করবে অনিলা?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বসন্তর কাছে পিস্তল আছে?

অনিলা অবাক হয়ে গেল শ্বশুরের কথা শুনে! পিস্তল! পিস্তলের কথা জানলে কী করে শ্বশুর। কিন্তু বললে, তা আমি কী করে জানবো!

—আর তোমার ছেলেই বা পিস্তলের কথা জানলে কী করে?

অনিলা অবাক হয়ে বললে, সুমন্ত? সে পিস্তলের কথা বলেছে?

—হ্যাঁ, তাই-তো বললে। আমার কাছে বসে কেবল টাকা চায়। টাকার ওপর তার খুব লোভ। টাকা দেখলেই কেবল চাইবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, টাকা নিয়ে কী করবি? তা কী বলে জানো? বলে পিস্তল কিনবে! আমি তো শুনে অবাক। শুধু আমি নই, আমার গদীতে যত লোক ছিল তারা সবাই অবাক। তখন জিজ্ঞেস করলাম 'পিস্তল দিয়ে কী করবি?' জবাবে বললে, 'মানুষ খুন করবো।' শুনছো কথা? সেই জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি তোমাকে বসন্ত কোথায়? তাকে পেলে একবার জিজ্ঞেস করতুম, পিস্তলের কথা সে ছেলেকে বললে কেন? আর পিস্তলের কথাই বা ওঠে কেন?

ভাগ্য ভালো যে বসন্ত সেদিন বাড়িতে এল না। তার পরদিনও এল না। তার পরদিনও না।

তারপর হঠাৎ একদিন বসন্ত বাড়ি এসে হাজির।

মাথার চুল উস্‌কো-খুশ্‌কো। চেহারা দেখেই বোঝা গেল ক'দিন ধরে খাওয়া হয়নি। এসেই বললে, কিছু খেতে দাও আগে।

অনিলা তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে দিলে। বসন্ত বললে, না খেয়ে আর কিছু কথা বলবো না।

গোগ্রাসে সব ভাত খেয়ে নিলে বসন্ত। তারপর যেন একটু স্থির হলো।

অনিলা জিজ্ঞেস করলে, এতদিন কোথায় ছিলে? এ-রকম চেহারা কেন তোমার? চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছিলে?

বসন্ত বললে—খোকা কেমন আছে?

—ভালো। সে তো বাবার কাছেই থাকে সারাদিন। নাতিকে নিয়েই তিনি মশগুল। তোমার পকেটে সেদিন পিস্তল দেখেছিল সুমন্ত, সে-কথা সে বাবাকে বলে দিয়েছে।

বসন্ত চম্‌কে উঠলো। বললে, পিস্তল? পিস্তলের কথা সুমন্ত জানলে কী করে?

অনিলা বললে, বা-রে, সেবার তুমি যখন বাড়ি এসেছিলে তখন সুমন্ত তোমার জামার পকেটে হাত দিয়ে পিস্তল বার করেছিলো না? মনে নেই তোমার?

বসন্ত বললে, এই বয়েসেই বড় দুষ্টু হয়েছে আদর পেয়ে-পেয়ে। সব জিনিসে হাত দেয় কেন সে?

অনিলা বললে, তা তুমিই বা পকেটে পিস্তল রাখো কেন? পিস্তল দিয়ে তুমি কী কারো?

অনিলা বললে—আমি যাই-ই করি না কেন, তাতে তোমারই বা কী আর সুমন্তরই বা কী?

অনিলা বললে—সব কথায় তুমি অমন রেগে যাও কেন? আমি কিছু অন্যায় কথা বলেছি?

বসন্ত বললে—অন্যায় তো বলেছোই। আমি তো তোমাদের কোনও কথায় মাথা ঘামাই না। তুমি কী করছো, না করছো তা-তো আমি কখ্‌খনো জিজ্ঞেস করতে যাই না!

অনিলা বললে—তুমি আজকাল অত খিট্‌খিটে হয়ে গেলে কেন, আগে তো এমন ছিলে না! তোমার শরীর খারাপ নাকি?

এতক্ষণ কী করে খবরটা হেমন্ত বিশ্বাসের কানে গেছে যে, বসন্ত বাড়ী এসেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে চলে এসেছে সে। বললে এই যে, কখন এলে?

বসন্ত বললে, এই একটু আগে।

—কই, আমি তো সদর-ঘরেই বসেছিলুম, তোমাকে তো দেখতে পেলুম না।

বসন্ত বললে—আমি খিড়কী-পুকুরের দিক দিয়ে এসেছি, পাকা রাস্তা দিয়ে আসিনি।

সুমন্ত বাবাকে দেখতে পেয়ে খুব খুশী। এসেই একেবারে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে। বললে, বাবা তুমি কোথায় ছিলে এতদিন?

বসন্ত বললে, চুপ করো, আমি তোমার দাদুর সঙ্গে কথা বলছি।

সুমন্ত বললে, জানো বাবা, দাদুর অনেক টাকা আছে, সব টাকা সিন্দুকে লুকিয়ে রাখে!

বসন্ত বললে, বলছি, তুমি চুপ করো এখন।

কিন্তু সুমন্ত থামলো না। বলতে লাগলো, জানো বাবা টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়। দাদু বলেছে চাল কেনা যায়, ডাল কেনা যায়, কাপড় কেনা যায়, সোনা-রুপো-গয়না, বাড়ি-ঘর সব কিছু কেনা যায়। পৃথিবীর সব চেয়ে দামী জিনিস নাকি এই টাকা। হ্যাঁ বাবা, এই টাকা দিয়ে পিস্তল কেনা যায় ?

যেন বোমা পড়লো সকলের মাথার ওপর।

হেমন্ত বিশ্বাস প্রথমেই নিস্তব্ধতা ভাঙলো, বললে, তোমার নাকি পিস্তল আছে ? তোমার পকেটে নাকি পিস্তল থাকে ?

বসন্ত বললে—তোমাকে কে বললে ?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—যে-ই বলুক, আমি যে-কথা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দাও। তোমার কাছে পিস্তল থাকে কিনা, তাই বলো !

বসন্ত বললে—শুধু পিস্তল কেন, দরকার হলে বন্দুকও রাখতে হয় কাছে। তাতে কী হয়েছে ?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়ে তোমার কি এই সব শিক্ষা হয়েছে ?

বসন্ত বললে—কলেজে গিয়ে লেখাপড়া করে বি-এ পাশ করেছি আমি।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তা তো জানি, কিন্তু কলেজের বাইরে ? সেখানে তো শুনেছি আজকাল অনেক পার্টি-ফার্টি আছে, তুমি কি সব পার্টিতে মেশো নাকি ?

বসন্ত বললে—কলকাতায় লক্ষ-লক্ষ লোক আছে, কারোর না কারুর সঙ্গে তো মিশতেই হবে। চুপ-চাপ হোটেলে তো আর বসে থাকা যায় না।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কিন্তু পিস্তল-পার্টি ছাড়া কি আর কোনও মেশবার লোক নেই ? রামকৃষ্ণ-মিশন কি গৌড়ীয় মঠও তো আছে কলকাতায়। থিয়েটারের ক্লাবও তো আছে কলকাতায়। তাছাড়া আরো কত কী আছে সেখানে—তাদের সঙ্গে মিশতে পারো না ?

বসন্ত বললে—যারা লেখাপড়া জানে, শিক্ষিত ভদ্র ছেলে তাদের সঙ্গেই আমার বরাবর মেলামেশা ছিল।

—যারা পিস্তলবাজি করে তারা কি শিক্ষিত-ভদ্র ছেলে ? আর কোনও শিক্ষিত-ভদ্র ছেলেদের খুঁজে পেলে না ?

বসন্ত বললে, যারা দেশের মানুষের কথা ভাবে, তাদের সঙ্গেই আমি মিশেছি।

—এখন কি তাদের সঙ্গে মিশতেই কলকাতায় যাও ?

বসন্ত একটু চুপ করে থেকে তারপর বললে, এই কুসুমগঞ্জে কি মেশবার মত কোন লোক আছে ? কার সঙ্গে এখানে মিশবো বলো ?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কেন, আমার ব্যবসায় তো আমাকে একটু সাহায্যও করতে পারো।

বসন্ত বললে—তোমার ব্যবসা আমার পছন্দ হয় না।

—কেন ?

বসন্ত বললে—সে তো আমি অনেকবার বলেছি। অন্য লোকের দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজের পেট ভরানোটা তো ভালো কাজ নয়।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে—কিন্তু আমি না থাকলে কে তাদের বিপদের দিনে দেখতো ?
বসন্ত বললে—যে-দেশে তুমি নেই, সে-দেশের লোকেরা কি বেঁচে নেই ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে—আমি কি একলাই মহাজনী কারবার করি ? পৃথিবীর অন্য দেশে কি আর কোনও মহাজন নেই ?
বসন্ত বললে, এই সব তর্ক আমি তোমার সঙ্গে এখন করতে চাই না।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, মানে তুমি মনে করো মহাজনী কারবার করা পাপ ?
বসন্ত বললে—হ্যাঁ পাপই তো! ব্যাংকও মহাজনী কারবার করে, তারাও সুদ নিয়ে টাকা খাটায়, কিন্তু তোমার মত গরীবদের রক্ত চুষে খায় না। এমন করে চাষীদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের পথে বসায় না। তোমার মত তাদের গলাও তারা কাটে না।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে—কলকাতায় গিয়ে তুমি এই সব কথা শিখে এসেছ ? এই সব শেখবার জন্যে আমি তোমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলুম ?
বসন্ত বলেছিল, কলকাতায় না গিয়েও এসব কথা শেখা যায়। এ শিখতে গেলে কলকাতায় যেতে হয় না কাউকে। আমি ছোটবেলা থেকে তোমার কাছে থেকে নিজের চোখে দেখেছি। তোমার কাছে এসে টাকা ধার নিয়ে কত লোক শেষকালে ধার শোধ করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, তা-ও আমার নিজের চোখে দেখা। বরং কলকাতায় না গিয়ে এখানে থাকলে আরো বেশি দেখতে পেতুম।
হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, তা আমি আমার হক্কের সুদ ফেরত চাইব না ? তুমি কি বলতে চাও আমি আমার দেনাদারদের সব সুদ মকুব করে দেব ? টাকা উপায় করতে বুঝি আমাকে কষ্ট করতে হয়নি, আমার মাথায় ঘাম পায়ে ফেলতে হয়নি ? আমার কি টাকার গাছ আছে ?
এ-কথার হয়তো শেষ হত না, কিংবা এ-তর্ক হয়ত আরো অনেকক্ষণ ধরে চলতো, কিন্তু ওদিকে আবার আর একজন কে বাইরে থেকে ডাকলে—বিশ্বাসমশাই বাড়ি আছেন ?
হেমন্ত বিশ্বাস আর দাঁড়ালো না। হয়তো কোনও দেনদার সুদ দিতে এসেছে। কিংবা হয়ত টাকা ধার নিতে এসেছে।
অনিলা বললে, এ কি, তুমি না খেয়েই উঠে পড়লে যে ?
বসন্ত বললে, আমার আর ক্ষিধে নেই।
বলে উঠে দাঁড়াতেই অনিলা বললে, এই রকম না খেয়ে-খেয়েই তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।
ততক্ষণে কুয়োর কাছে গিয়ে বসন্ত এঁটো হাত ধুয়ে ফেলেছে।
অনিলা জিজ্ঞেস করলে, কলকাতায় কিছু কাজের বন্দোবস্ত করতে পারলে ?
বসন্ত বললে, চেষ্টা তো করে যাচ্ছি, কিন্তু এখনও কিছু বন্দোবস্ত করতে পারিনি। করতে পারলেই আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবো!
অনিলা বললে—কেন, এখানে এই কুসুমগঞ্জে তো আমার কোনও কষ্ট হয় না। আর শুনেছি তো কলকাতায় অনেক কষ্ট।
—কীসের কষ্ট ?
—সেখানে বাড়ি ভাড়াই তোমার অনেক পড়ে যাবে! এখানে বাবা আছেন, তাই

কিছু বুঝতে পারছি না। তাছাড়া সেখানে ভোলার মা'র মত লোক কোথায় পাবে ?
বসন্ত বললে, জীবনে একটু কষ্ট করা ভালো। পৃথিবীতে কত মানুষ কত কষ্ট করে সংসার চালায়, তা যদি তুমি জানতে! অনেকে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তা শুধু কলকাতাই বা কেন, এখানে এই কুসুমগঞ্জে গরীব লোক নেই ভেবেছ ? তুমি বাড়ির মধ্যে থাকো তাই বুঝতে পারো না। একটু মুচিপাড়া কি গোয়ালা-পাড়ার দিকে গেলেই টের পাওয়া যায়। থালা-বাসন বিক্রি করে তারা চাল কিনে খাচ্ছে এখন।
অনিলা বললে, সে তো দেখতে পাই রোজ। বাবার কাছে এসে বাড়ির বাসন-কোসন বিক্রি করে যায় রোজ। কিন্তু তার জন্যে কি বাবা দায়ী ?
বসন্ত বললে, বাবা দায়ী নয় তো কে দায়ী ? তুমি কি মনে কর তারা কখনও আর ওই সব বাসন-কোসন বাবার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে! ওই যে আমাদের বাগানটা। যে-বাগানের আম-কাঁঠাল আমি-তুমি খাই, ওটা আগে কাদের ছিল জানো ? গয়লাপাড়ার ঘোষেদের। ওদের অবস্থা যখন খারাপ হলো তখন বাবার কাছে বাগানটা বন্ধক রেখেছিল! কিন্তু তারপর কি আর ও-বাগান ছাড়িয়ে নিতে পেরেছে ? বাবা ওই গাছ বেচে বছরে কত টাকা পায় তা জানো ?
—না। কত টাকা ?
—সাত হাজার টাকা! বাবা কোন পরিশ্রম না করে ওই একটা বাগান থেকে বছরে সাত হাজার টাকা আয় করে। এই রকম পাঁচটা বাগান আছে বাবার। এক-একটা বাগান কিনেছিল গড়ে পঞ্চাশ টাকা দামে।
অনিলা কথাগুলো শুনছিল। বসন্ত থামতেই বললে, তা ও-সব তো বাবা আমাদের জন্যেই করে যাচ্ছেন। একদিন তো আমরাই ও-সব কিছুর মালিক হবো। ও-সব তো আর বাবার সঙ্গে যাবে না।
বসন্ত বললে, তুমি ও-সব বুঝবে না। পাপের পয়সা যে পায় তারও পাপ হয়!
অনিলা বললে—পাপ বলছো কেন ? ও ব্যবসা তো অনেকেই করে।
বসন্ত বললে—যারা অন্যায় করে, তার জন্যে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত!
অনিলা বললে—সে শাস্তি যদি পেতেই হয় তো, ভগবান নিজেই তাকে সে-শাস্তি দেবেন। কত লোকই তো আছে, যারা পাপ করেও জীবনটা সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে দেয়।
বসন্ত বললে, ভগবান নিজের হাতে তো শাস্তি দেন না। ভগবান শাস্তি দেবার জন্যে কিছু লোক পাঠিয়ে দেন পৃথিবীতে। তারাই পাপীকে শাস্তি দেয়।
তারপর একটু থেমে বললে, আর পাপ করেও জীবনটা সুখে কাটিয়ে দেবার কথা বলছো ? সুখ কাকে বলে তার মানেটা আগে বলে দাও। খাওয়া-পরার সুখটাই কি সুখ ? তাহ'লে বাবা রোজ রাত্তিরে আর বিকেলে আফিম খায় কেন ?
অনিলা সত্যিই শ্বশুরকে নিজের হাতে রোজ আফিমের গুলি দিয়ে আসতো। আফিমের সঙ্গে দুধও গরম করে দিত। আফিমের গুলিটা মুখে দিয়েই হেমন্ত বিশ্বাস গরম দুধটা চুমুক দিয়ে খেত।
বসন্ত বললে, পাপ শুধু বাবার একলার নয় অনিলা, তুমি জানো না বাবার ওই টাকায় আমি লেখাপড়া শিখেছি, বি-এ পাশ করেছি তুমি নিজেও সেই পাপের

টাকায় এ-বাড়ির বউ হয়ে সুখ ভোগ করছো, এতে তোমারও পাপ হচ্ছে, আমারও পাপ হচ্ছে। তখন অনিলা এ-সব কথা ভালো করে বুঝতো না। অথচ বসন্ত বার-বার করে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতো।
অনিলা বলতো, তুমি যদি এতই বোঝো তাহ'লে কেন আমাকে বিয়ে করলে?
বসন্ত বললে, বিয়ে করেছি তো কী হয়েছে, আমরা তো এ-বাড়িতে বেশিদিন থাকবো না। বেশিদিন পাপের ছোঁয়াচ তোমার গায়ে লাগতে দেব না। যতদিন নিজের একটা স্বাধীন উপার্জন না হয়, ততদিন তুমি একটু সহ্য করো।
সত্যিই, বসন্ত নিজে কিছু করবার জন্যে যে আপ্রাণ চেষ্টা করতো, তা বুঝতে পারতো অনিলা। তাই কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো—ঠাকুর, ওঁর একটা কিছু করে দাও তুমি তাহলে ও-ও বাঁচে, আমিও বাঁচি।

সুশীলা যখন বললে তার খালাস হবার হুকুম হয়েছে, তখন প্রথমে তার বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয়নি। চোদ্দ বছর তাকে একটানা জেল খাটতে হবে এইটেই তার ধারণা ছিল। চোদ্দটা বছর কি কম? চোদ্দ বছর মানেই তো সারা জীবন!
প্রথম দিকে খুবই কষ্ট হতো সুমন্তর জন্যে! হেমন্ত বিশ্বাসের ছেলে বসন্ত বিশ্বাস, আর বসন্ত বিশ্বাসের ছেলে সুমন্ত বিশ্বাস। নাতির নামটা হেমন্ত বিশ্বাসই রেখেছিল। হেমন্ত বিশ্বাস বলেছিল, জানো বউমা, অনেক টাকা খরচ করেছিলাম বসন্তকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার জন্যে! বসন্তটা মানুষ হলো না, এখন দেখি সুমন্ত যদি মানুষ হয়।
একদিন অনেক রাত্রে বসন্ত হঠাৎ বাড়িতে এসে হাজির। কোথা দিয়ে কেমন ভাবে সে বাড়িতে ঢুকলো তা অনিলা বুঝতে পারলে না।
জিজ্ঞেস করলে, তুমি?
বসন্ত বললে—কেন, আসতে নেই?
অনিলা বললে—না, তা বলছি না। কিন্তু এই অসময়ে তো তুমি আসো না। এত রাত্তিরে কী করে তুমি বাড়ি ঢুকলে? কে দরজা খুলে দিলে?
বসন্ত বললে—কেউ দরজা খুলে দেয়নি, আমি উঠোনের পাঁচিল টপ্‌কে ঢুকেছি। কেউ জানতে পারেনি। আমার ভীষণ দরকার তোমার সঙ্গে। কিছু টাকা চাই। আমাকে কিছু টাকা দিতে পারো?
—টাকা?
বসন্ত বললে, হ্যাঁ টাকা, শ'দুয়েক টাকা হলেই এখনকার মত চলে যাবে আমার।
ততক্ষণে অনিলা ঘরের আলোটা জেবলে দিয়েছে। সুমন্তর তখন বয়েস কম। সে তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল অনিলার পাশে। কিন্তু আলো জবলে উঠতেও তার ঘুম ভাঙলো না।
বসন্ত বললে—আলোটা নিবিয়ে দাও, খোকা জেগে উঠবে।
অনিলা আলোটা নিভিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি টাকা চাইতেই এসেছো?
বসন্ত বললে—হ্যাঁ, টাকাটা নিয়েই আবার চলে যাবো।

—কোথায় যাবে ?

—সে কথা জেনে তোমার কী লাভ ?

অনিলা বললে, তুমি জানো না যে আমার কাছে টাকা থাকে না ? টাকা কি বাবা আমার হাতে কখনও দেন ? বিয়ের সময় যে-সব গয়না পরতে দিয়েছিলেন সেগুলো পর্যন্ত তিনি কেড়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন। সে সব কথা তুমি তো জানো।

বসন্ত বললে—তাহলে আর কী হবে ! আমি তাহ'লে যাই !

—তুমি চলে যাবে ?

—হ্যাঁ !

অনিলা বললে, তুমি যদি বাড়িতেই না থাকবে তাহলে বিয়ে করেছিলে কেন আমাকে ? এমন বিয়ে কি না করলে চলতো না ?

বসন্ত বললে, আমি কী করবো বলো ? সব কিছুর জন্যেই তো আমার বাবা দায়ী।

অনিলা বললে—তোমার বাবার দোষের জন্য আমি ভুগবো কেন সেটা বলতে পারো ? আমি তোমার কাছে কী এমন দোষ করেছি যে, সারা জীবন আমাকে এমনি করে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে।

বসন্ত বললে—তোমার তো খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট নেই এখানে !

অনিলা বললে, খাওয়া-পরার কষ্টের জন্যেই কি লোকে বিয়ে করে ?

বসন্ত বললে—তোমার বাপের বাড়িতে তো তোমার খাওয়া-পরার কষ্টও ছিল ! সে কষ্টটাই কি কিছু কম ?

অনিলা রেগে উঠলো। বললে, দেখ বাজে বাজে কথা বোল না। আমার রূপ দেখে তোমার বাবা আমাকে এ-বাড়িতে বউ করে এনেছেন, তুমি যাতে সংসারী হও সেইটেই তাঁর ইচ্ছে ছিল। কেন তুমি এই রকম পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, কেন তুমি সংসারী হবে না ? কেবল বাইরে-বাইরে পড়ে থাকো কেন ? কী তোমার কাজ এত বাইরে ?

বসন্ত বললে, সে-সব কথার কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে নাকি এখন ?

অনিলা বললে, হ্যাঁ, দিতে হবে। আমি অনেক সহ্য করেছি এতদিন, অনেকদিন সব মুখ বুজে সহ্য করেছি, কিন্তু এখন আর সহ্য করবো না। এখন তোমাকে বলতেই হবে তুমি কী নিয়ে এত ব্যস্ত থাকো, কলকাতায় তোমার কী এত কাজ ?

বসন্ত বললে—অত চেঁচিও না, অত চেঁচালে আমি কিন্তু এখানে যাও আসতুম তাও আর আসবো না।

অনিলা বললে, তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ?

বসন্ত বললে—শুধু তোমাকে নয়, বাবাকেও ভয় দেখিয়েছি এতদিন। আমাকে তোমরা কেউ-ই এতদিন চিনতে পারলে না। আমার পকেটে রিভলবার আছে তা জানো তো ?

অনিলা বললে, কেন, আমাকে তুমি খুন করবে নাকি ? ভেবেছো আমি ছোট্ট খুকি যে, রিভলবারের কথা শুনে আমি ভয় পাবো ?

বসন্ত আর দাঁড়াতে চাইলে না। যেদিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকেই চলে যাচ্ছিল। অনিলা সামনে গিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়ালো।

বললে, কোথায় যাচ্ছো ?

বসন্ত বললে—যেখানেই যাই না, তোমার কী ?
অনিলা বললে, আমি তাহলে চেঁচাবো। তাতে বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। তিনি সব জানতে পারবেন।
বসন্ত বললে—ছাড়ো, পথ ছাড়ো আগে, তারপর যত পারো চেঁচিও—আমি বারণ করতে আসবো না।
অনিলা বললে, না, আমি কিছুতেই তোমাকে চলে যেতে দেব না। দেখি তুমি কী করে চলে যাও।
বসন্ত বললে, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। আমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে।
—কে তারা ? কারা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ?
বসন্ত বললে—তারা আমাদের দলের লোক।
—কীসের দল ?
বসন্ত বললে—সে তুমি বুঝবে না।
অনিলা বললে, আমি যদি কিছুই না বুঝি তাহলে তোমার বউ হয়েছিলুম কেন ? আমাকে বুঝিয়ে দিলেই আমি বুঝবো !
—তুমি একটু আস্তে আস্তে কথা বলো। বাবার ঘুম ভেঙে গেলে তখন খুব মুশকিল হবে।
অনিলা বললে, বাবা আফিম খেয়ে শুয়েছেন। অত সহজে তাঁর ঘুম ভাঙবে না। তুমি বলো, আমি শুনি। কোথায় যাও তুমি, কী করো, আজকে সব আমাকে বলতে হবে। কেন তোমার পকেটে রিভলবার থাকে ? তোমার কীসের দল ? দলের কী কাজ ? আর এত টাকারই বা কীসের দরকার তোমার ? আর এত টাকারই যদি তোমার দরকার তো বাবার কাছে তা চাইলেই পারো। বাবার তো টাকার অভাব নেই।
বসন্ত বললে, বাবার টাকা আমি নেব না বলেই তো তোমার কাছে টাকা চাইছি।
অনিলা বললে, আমার টাকাও তো বাবারই টাকা। আমার কি আলাদা কোন আয় আছে ?
বসন্ত বললে—তোমার সংসার-খরচের টাকা থেকেও যদি কিছু দিতে।
অনিলা বললে, সংসার-খরচের জন্যে কি বাবা আমাকে কিছু টাকা আলাদা দেন ? তুমি কি জানো না যে বাবার কাছে টাকাই হচ্ছে সর্বস্ব। কিছু কেনবার দরকার হলে বাবা সেটা কিনে দেন। তেল নুন থেকে আরম্ভ করে আমার শাড়ি খোকার জামা সবই বাবা নিজের হাতে কিনে দেন। টাকা কি কখনও বাবা কাউকে দেন ?
বসন্ত বললে, তা তোমার নিজের গয়না-টয়না কিছু নেই ?
অনিলা অন্ধকারের মধ্যেই একটা করুণ হাসি হাসলো। বললে, তুমি সব জেনেও না-জানার ভান করছো ? এই দেখ—বলে ঘরের আলোটা আবার জ্বালালো। বললে, এই দেখ, আমার গলা দেখ, আমার দু'টো হাত দেখ, কিছু গয়না দেখতে পাচ্ছো ? কোনও গয়না আমার নিজের বলে আছে ? লোকে জানে মস্ত বড় ঘরের বউ আমি। কিন্তু তোমাকেও কী বলে দিতে হবে, কেন সধবা মানুষ হয়েও আমার গলায়, আমার হাতে কোন গয়না নেই। এই এয়োতীর চিহ্ন একজোড়া শাঁখা ছাড়া হাত দু'টোও আমার খালি। কেন খালি তুমি জানো না ? ইচ্ছে হলেও সুমন্তকে

আমি একটা খেলনাও কিনে দিতে পারি না কেন, তা তুমি জানো না? কিংবা হয়ত সব কিছু জেনেও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?
বসন্ত বললে, আমি অনেক আশা করে এসেছিলুম। যখন টাকা পেলুম না তখন আর এখানে থেকে মিছিমিছি কী করবো, আমি চলি—
—না যেও না, দাঁড়াও!
বসন্ত ফিরে দাঁড়ালো। অনিলা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী যে একটা দেখে থমকে দাঁড়ালো। বললে, একি, তোমার জামার পেছনে রক্তের দাগ কেন?
বলে বসন্তর জামায় হাত দিতেই তার নিজের হাতের আঙুলগুলো লাল হয়ে গেল। বললে, এ কি, এত রক্ত কোথা থেকে এল? তুমি কী কোথাও পড়ে গিয়েছিলে?
বসন্ত তাড়াতাড়ি জামাটা টেনে ধরেছে। টেনে ধরতেই এক থাবড়া রক্ত অনিলার গায়ে এসে লাগলো। সেই রক্তের ছিটে লেগে তার শাড়িটাও দাগী হয়ে গেল। রক্ত দেখে তার হাতটাও শিথিল হয়ে এল। আর সেই ফাঁকে বসন্তও এক লাফে যেখান দিয়ে যেমন করে এসেছিল. তেমনি করে পালিয়ে গেল। পালিয়ে যেতে গিয়ে গরুর গোয়ালের টিনের চালের ওপর একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দের মত শব্দ হলো। তাতে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরে খান্ খান্ হয়ে গেল।
—কে?—কে?—কে?
ওদিক থেকে হেমন্ত বিশ্বাসের গলার আওয়াজ এসে পড়লো।
—বউমা, বউমা, ওটা কীসের শব্দ হলো যেন?
অনিলা পাথরের মতন চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।
হেমন্ত বিশ্বাসের সন্দেহ-শক্তি বড় প্রবল। অনেক সোনা-দানা-রুপো-টাকা-আনা-পাই গচ্ছিত আছে তার বাড়িতে। আফিম খেলেও একটু শব্দতেই তার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমের ঘোরেই শব্দটা কানে গিয়েছিল তার। বাড়ির সব ঘরগুলো হাতড়াতে-হাতড়াতে একেবারে অনিলার ঘরের সামনে এসে হাজির হলো।
—বউমা, ঝপাং করে কীসের একটা শব্দ হলো না?
অনিলা কোনও জবাব দিলে না সে-কথার।
হেমন্ত বিশ্বাস আরো কাছে এগিয়ে এল।
—কী হলো বউমা, তুমি এ-রকম এখানে এত রাত্তিরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? শব্দটা কীসের?
তারপর হঠাৎ বউমার শাড়িটার ওপর নজর পড়লো।
বললে, একি, তোমার শাড়িতে এত রক্ত লাগলো কীসের? কী হয়েছিল? পড়ে গিয়েছিলে?
অনিলা নিজেকে সামলে নিলে।
বললে, হ্যাঁ।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কী করে পড়ে গেলে? কুয়োতলায় যেতে গিয়ে পা পিছলে গিয়েছিলো বুঝি?
অনিলা আবার বললে, হ্যাঁ।
—তাহ'লে মলম লাগাচ্ছো না কেন?
অনিলা কিছু জবাব দিলে না।

হেমন্ত বিশ্বাস আবার জিজ্ঞেস করলে, সে হারামজাদা কোথায় ? সেই বসন্ত হারামজাদা ? সে বাড়ি নেই বুঝি ?
অনিলা বললে, না।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কোথায় যায় বলতো সে হারামজাদা ? ভেবেছিলুম, বিয়ের পর একটু সেয়ানা হবে। তোমাকেও তো বলেছিলুম তাকে একটু সংসারী করে তুলতে। তাও তুমি পারলে না ?
তারপর একটু হেসে হেমন্ত বিশ্বাস আবার বলতে লাগলো—সবই আমার কপাল, জানো বউমা, আমারই কপাল ! একটা মাত্তোর ছেলে, সেটাও মানুষ হলো না ! এবার যখন বাড়িতে আসবে, আমাকে খবর দিও তো ! আমি হারামজাদাকে কড়কে দেব। বিয়ে করেছে, ছেলে হয়েছে। এখনও মতি-গতি বদলানো না, এ তো ভালো কথা নয়। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম, কী বলবো তোমাকে। আমার তো মনে হলো বাড়িতে ডাকাত পড়লো বুঝি !
তারপর যখন বুঝলো যে ডাকাত পড়েনি, তখন যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো হেমন্ত বিশ্বাস। বললে, খুব সাবধানে থাকবে বউমা, বুঝলে, দিনকাল বড় খারাপ ! খুব সাবধানে থাকবে। লোকে বলছিল কলকাতায় নাকি নকশালরা খুব খুন-খারাপি শুরু হয়েছে। এত বয়েস হলো কখনও এমন কথা তো শুনিনি—ওরা কী করছে জানো ? ধরে-ধরে সব বড়লোকদের নাকি খুন করছে ! বুঝলে বউমা, বড়লোকরা কী এমন দোষ করেছে ? টাকা উপায় করে বলেই কী তাদের খুন করতে হবে ? টাকা উপায় করা কি দোষের ? তুমিই বলো বউমা ?
অনিলা কোনও কথা বললে না।
হেমন্ত বিশ্বাস আবার বলতে লাগলো—তুমি যে কিছু বলছো না বউমা ?
অনিলার মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা বেরোল। বললে—আমি কি বলবো ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না-না, তা বলছি না ! সত্যিই তো, তুমি মেয়েমানুষ, তুমি বাড়ির মধ্যে থাকো, তুমি কী করে খবর রাখবে ? কিন্তু আমাকে তো বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। শুনলাম নক্‌শালরা নাকি কলকাতায় তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। তারা বড়লোক দেখলেই নাকি তাকে খুন করছে, জানো ? কেন রে বাবা বড়লোকরা তোদের কী দোষ করলো ? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'টো বেশি টাকা উপায় করেছে বলে ? তা ক্ষমতা থাকে তো তোরাও টাকা উপায় কর না ! কে তোদের মানা করছে ?
হেমন্ত বিশ্বাস মনে-মনে খুব দুঃখ পেত ! একটা মাত্র ছেলে ওই ছেলের জন্ম দিয়েই গৃহিণী চলে গেছেন, ভালোই হয়েছে। নইলে ছেলের ব্যবহার দেখে তিনিও মনে কষ্ট পেতেন। ভগবান যা করেন তা বোধহয় মঙ্গলের জন্যেই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। বড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেদিনও যথারীতি হেমন্ত বিশ্বাস ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে নদীতে গিয়ে স্নান সেরে বাড়ি এসেছে। যতক্ষণ স্নান করেছে ততক্ষণ গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করেছে। তারপর একটা পাথর বাটিতে করে দু'টি মুড়ি খেয়ে জলযোগ করেছে। তারপর যথারীতি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম মানে তার নিজস্ব বন্ধকী কারবার করেছে। তারপর বেলা একটা নাগাদ ভেতর বাড়িতে এসে ডেকেছে—বউমা।

বউমা মানে অনিলা। অনিলা ওই সময শ্বশুরের ডাক শুনলেই বুঝতে পারতো যে শ্বশুরের ভাত বেড়ে দিতে হবে। বুঝতে পারতো শ্বশুরের খাওয়ার সময় হয়েছে। হেমন্ত বিশ্বাসকে ভাত বেড়ে দিত অনিলা।

খাওয়ার সময় শ্বশুরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কখন কী চাই তাও বুঝে নিতে হবে। বার-বার জিজ্ঞেস করতে হবে আর দু'টি ভাত চাই কিনা। শুধু ভাত নয়, ডাল, ভাজা, কী আব কিছুরও দরকার হতে পারে। সবই তদারক করতে হবে বউমাকে।

তারপর খেয়ে উঠে হেমন্ত বিশ্বাস কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবে যে-ঘরটায় তার সিন্দুক থাকে। সেই সিন্দুকটাই তার প্রাণের প্রাণ! তার ভেতরেই হেমন্ত বিশ্বাসের প্রাণ-পাখীটা রাখা আছে। আর সেই সিন্দুকের চাবিটা তার ট্যাকের ঘুনসীতে লটকানো থাকে।

সেদিনও তাই করেছে হেমন্ত বিশ্বাস। ঘুম থেকে উঠে সেদিনও ডেকেছে—বউমা। বউমা জানে ও-ডাকটা আফিমের ডাক। ওই সময়ে আফিম খাবার দরকার হয় হেমন্ত বিশ্বাসের নিজস্ব আফিমের কৌটো আছে একটা। তাতে আফিমের গুলি পাকিয়ে রাখা আছে ঠিক মাপের মত করে। একটু ঊনিশ-বিশ হবার উপায় নেই। তারপর আফিমের ড্যালাটা অনিলা হেমন্ত বিশ্বাসের হাতে দেবে। আফিমের ড্যালাটা মুখে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে দুধ চাই। ক্ষীর করা দুধ। গাঢ় দুধে ভর্তি বাটিটা নেবার জন্যে হাত বাড়াবে হেমন্ত বিশ্বাস। আফিম খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দুধ চাই—এইটেই নিয়ম।

তা অনিলা সেদিনও তার অন্য হাতে মজুত রেখে দিয়েছিল অন্য দিনের মত। দুধটা খেয়ে হেমন্ত বিশ্বাস বিকেল বেলা আবার চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসবে। তখন আসবে দেনাদারেরা তখন, আসবে পাওনাদারেরা! তখন সকলের সঙ্গে লেন-দেন, হিসেব-নিকেশ হবে।

তারপর যখন রাত গভীর হবে, অর্থাৎ রাত সাড়ে ন'টা কি দশটা বাজবে, তখন ভেতর-বাড়িতে এসে ডাকবে—বউমা!

অর্থাৎ তখন খাবার দিতে হবে শ্বশুরকে। অনিলা তৈরীই থাকে। সেই সময়ে আবার সেই একই রকম। সেই একই রকম ভাবে অনিলা শ্বশুরের খাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থাকবে। আর তারপর খাবার খেয়ে যখন নিজের ঘরে বিছানায় গিয়ে বসবে, তখন অনিলা আফিমের ড্যালাটা নিয়ে তার হাতে তুলে দেবে। আর এক

হাতে থাকবে গরম দুধের বাটি।
সেদিনও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।
আফিম আর দুধ খেয়ে হেমন্ত বিশ্বাস বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। শোবার আগে ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু যখন শেষ রাত, তখন হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ধাক্কা দিচ্ছিল।
—কে? কে?
হেমন্ত বিশ্বাসের মনে হয়েছিল বোধহয় বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।
আবার জিজ্ঞেস করলে, কে? কে? কারা দরজা ঠেলছে?
কিন্তু অত-ভাববার সময় নেই তখন হেমন্ত বিশ্বাসের। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলতেই চোখে পড়লো সামনেই দু'চারজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। হেমন্ত জিজ্ঞেস করলে কী ব্যাপার দারোগাবাবু?
দারোগাবাবু গম্ভীর গলায় বললে, আপনার ছেলের নাম বসন্ত বিশ্বাস?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ, কিন্তু কেন?
দারোগাবাবু বললে, আপনার ছেলে মারা গেছে।
—মারা গেছে?
অনিলার মাথায় যেন হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত হলো।
হেমন্ত বিশ্বাস আবার জিজ্ঞেস করলে, কী করে বসন্ত মারা গেল?
—পুলিশের গুলিতে!
হেমন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলে পুলিশের গুলিতে? কেন, কী করেছিল সে?
মানুষের জীবনে কখন যে কেমন করে হঠাৎ একদিন বিপদ ঘনিয়ে আসে, আর এসে একেবারে বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয়, তা কেউ বলতে পারে না। যে-ছেলের ওপর হেমন্ত বিশ্বাসের এত ভরসা ছিল সেই ছেলেই যে একদিন অপঘাতে মারা যাবে তা, কে কল্পনা করতে পেরেছিল?
সত্যিই, তারপর জানা গেল কলকাতায় যাবার পর থেকেই বসন্ত এমন একটা দলে পড়ে গিয়েছিল যাদের পুলিশি ভাষায় বলা হতো নক্‌শাল। শেষবারের মত আর তাকে দেখেনি অনিলা। যা কিছু করবার শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসই করেছিল ঝাড়গ্রামে গিয়ে। কোন এক জঙ্গলের মধ্যে তাদের দলের সঙ্গে পুলিশের দলের গুলি চালাচালি হয়েছিল। আর তাতেই একটা আচমকা গুলি খেয়ে বসন্ত প্রাণ দিয়েছিল।

আট বছর! এই আট বছরে অনেক কিছুই ঘটে গিয়েছিল অনিলার জীবনে। বসন্তর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যদি এ-কাহিনী শেষ হয়ে-যেত, তো তাহ'লে অনিলার শেষ জীবনটা এমন করে জেলখানায় কাটতো না।
বোধহয় আগের জন্মে অনেক পাপ করেছিল অনিলা। নইলে সে বিধবাই বা হবে কেন, আর তার ছেলেই বা অমন হবে কেন? আর শ্বশুর হেমন্ত বিশ্বাসই বা শেষ জীবনে অমন কাণ্ড করবে কেন?

সন্তর যত বয়েস বাড়তে লাগলো ততই যেন সে কেমন বদলে যেতে লাগলো। মায়ের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করতো। অনিলা জিজ্ঞেস করতো—কোথায় থাকিস তুই সারাদিন?
সন্তর বলতো, সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে তোমার কাছে?
অনিলা বলতো, তা সারাদিন আমি ভাত নিয়ে বসে রইলুম, তুই খেলি না, আমার ভাবনা হয় না?
সন্তর বলতো, আমার কী নিজের কাজ থাকতে নেই তা বলে? তুমি নিজে খেয়ে নিলেই পারতে!
অনিলা বলতো, তুই যদি মা হতিস, তাহ'লে বুঝতিস ছেলের জন্যে মায়ের ভাবনা হয় কি না!
কথা কাটাকাটির আওয়াজ কানে যেতেই হেমন্ত বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপ ছেড়ে ভেতর বাড়িতে আসতো। বলতো, কী হয়েছে বউমা? এত চেঁচামেচি কিসের?
অনিলা বলতো, এই দেখুন না বাবা, আপনার নাতির কাণ্ড। সারাদিন কোথায় কী রাজকার্য নিয়ে আছে, আমি জিজ্ঞেস করেছি, তাই ছেলে একেবারে রেগে চীৎকার করছে। এদিকে আমার যে সারাদিন খাওয়া হলো না, তা একবার ভাবছে না।
হেমন্ত বিশ্বাস নাতির দিকে ফিরে বললে, কোথায় গিয়েছিলি রে?
সন্তর বললে, আমার নিজের কাজে।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, নিজের কাজ মানে? তোর আবার নিজের কাজ কি? লেখা-পড়া তো সিকেয় উঠেছে। তিনবার ফেল করে ক্লাশেও উঠতে পারলি না। তা লেখা-পড়া না হলো না হলো! তোর বাবা তো লেখা-পড়া শিখে আমার মাথা একেবারে কিনে নিয়েছিল। তা লেখা-পড়া সকলের হয় না, কিন্তু ভাতটা সময় করে খেয়ে নিয়ে গেলে তো গেরস্থের উপকার হয়। সেটাও কী তোর দ্বারা হবে না?
সন্তর বললে, আমার খাওয়া হোক আর না হোক, মা খেয়ে নিতে পারে না?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তুই দেখছি তোর বাবার ধাঁচ পেয়েছিস! ওরে হারামজাদা, এই যে তুই জামা-কাপড় পরে আছিস, এই যে-বাড়িতে তুই আছিস, এসব কোত্থেকে হলো তার খবর রাখিস তুই? আমি যদি মুখের রক্ত উঠিয়ে টাকা উপায় না করতুম তো তুই এইরকম করে দিনরাত আড্ডা দিয়ে বেড়াতে পারতিস?
সন্তর এ-কথার কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।
হেমন্ত বিশ্বাস কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, কিরে আমার জবাব দিচ্ছিস নে যে? এমনি আড্ডা দিয়ে বেড়াতে পারতিস?
এবার আর সন্তর সেখানে দাঁড়ালো না। হেমন্ত বিশ্বাসের কথার জবাব না দিয়ে সোজা নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল।
কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস টপ করে সন্তর একখানা হাত ধরে ফেললে।
বললে, যাচ্ছিস কোথায়? কথার জবাব না দিয়ে যাচ্ছিস কোথায়? আমার কথাগুলো কি কানে যাচ্ছে না তোর?
সন্তর বললে, আমি কি বলবো?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কেন, আমি বুড়োমানুষ বলে কী আমার কথার কোনও দাম নেই ? তা আমি কী একটা মানুষ নই ?
সুমন্ত বললে, তুমি আমার হাত ছাড়ো !
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না, হাত ছাড়বো না। তুই কি করতে পারিস ? আমার জবাব না দিয়ে তুই কোথাও যেতে পারবি না। আমি অনেক সহ্য করেছি। এখন থেকে আর সহ্য করবো না।
অনিলা শ্বশুরের সামনে এসে বললে বাবা, আপনি যান, আপনি নিজের কাজে যান, মিছিমিছি রাগ করলে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে !
হেমন্ত বিশ্বাস বললে—মিছিমিছি মানে ? আমি বসন্তর বেলায় কিছু বলিনি। ভেবেছি বিয়ে হলে একদিন আপনি-আপনিই শুনবে। তার ফল তো দেখেছি। এখন সুমন্তর বেলায় আর তা হতে দিতে চাই না।
অনিলা বললে, কিন্তু আপনার শরীর খারাপ হবে যে !
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, শরীর আমার এমনিতেই ভেবে-ভেবে খারাপ হয়ে আছে। এরপর আবার কী খারাপ হবে ?
তারপর সুমন্তর দিকে চেয়ে বললে, কিরে জবাব দিবি না আমার কথার ?
সুমন্ত বললে, না।
—আবার মুখেব ওপর 'না' বলা ? বলেই হেমন্ত বিশ্বাস নাতির গালের ওপর ঠাস করে একটা চড় মারলে।
বললে, আমার মুখের ওপর 'না' বলছে। এ তো বড় বেয়াড়া ছেলে হয়েছে তোমার বউমা ! যা দেখতে পারিনা, তাই-ই হয়েছে। সবই আমার কপাল বউমা, সবই আমার কপাল !
সুমন্ত তখন হেমন্ত বিশ্বাসের চড় খেয়ে কাঁদছে ! দু'হাতে চোখ-মুখ ঢেকে কাঁদছে ! হেমন্ত বিশ্বাস বলে উঠলো, থাম-থাম বলছি। নিজে অন্যায করে আবার কাঁদছে ! কাঁদতে লজ্জা করে না ? এত বড় ধাড়ি ছেলে হলো, ঠাকুর্দার মুখের ওপর কথা ! মুখ তোল্ তুই—দেখি।
সুমন্তর হাত দু'টো টেনে মুখটা দেখলে হেমন্ত বিশ্বাস।
বললে, আর কখনও মুখের ওপর কথা বলবি ?
সুমন্ত চোখ দু'টো বুঁজিয়ে রইল।
—কিরে, কথা বলছিস নে যে ! এ ঠিক বাপের ধারা পেয়েছে, ওর বাপও ঠিক এমনি ছিল। একগুঁয়ের একশেষ !
এতক্ষণে ছেলের কান্না দেখে অনিলা এসে আবার সামনে দাঁড়ালো।
বললে, বাবা, ওকে ছেড়ে দিন, ও আর করবে না। আপনার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। কত লোক বসে আছে চণ্ডীমণ্ডপে।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, থাকুক বসে। নিজের ছেলেও আমার কথা শোনেনি। তা সে বেটা জাহান্নামে গেছে, আমার হাড় জুড়িয়েছে। একটা মাত্তোর নাতি, সেও কিনা বাপের মতন বখে গেল। তাহ'লে কার জন্যে এত সম্পত্তি করছি ! নাতিটাও কী মনের মত হতে নেই ! আমি ভগবানের কাছে কত পাপ করেছিলুম, যে আমাকে আজকে এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।
তারপর বললে, যাক্ গে, যা আছে কপালে তাই-ই হবে—

বলতে-বলতে হেমন্ত বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলে গেল।

সুমন্ত তখন দাঁড়িয়ে। অনিলা ছেলের কাছে গিয়ে বললে—কেন অমন করিস বল তো? দাদুর সঙ্গে কী ওই রকম করে কথা বলতে আছে? তোর জন্যেই তো ওই বুড়ো মানুষটা খেটে-খেটে এত সম্পত্তি করেছেন। উনি তো আর টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। একদিন তো সব তোরই হবে! তুই নিজের ভালোটা একবার বুঝতে শিখলি না? এই বাড়ি, এই জমি-জমা, ক্ষেত-খামার তো সব একদিন তোরই হবে, ওঁনাকে চটাতে আছে?

সুমন্ত বললে, আমি এ-সম্পত্তি চাই না।

অনিলা অবাক হয়ে গেল ছেলের কথা শুনে। ছেলে বলে কী? নিজের ভালোটাও নিজে বোঝে না!

অনিলা বললে, সম্পত্তি চাস না মানে?

সুমন্ত বললে, ফসব দাদুর পাপের টাকা।

অনিলা চমকে উঠলো ছেলের কথা শুনে। ঠিক এই ধরনের কথা নিজের স্বামীর মুখেও বারবার শুনে এসেছিল সে। এসব কথা সুমন্তকে কে শেখালে? তার মনের ভেতরে একটা পরিচিত আতঙ্ক আবার সাপের মত ফণা তুললো।

বললে, এসব কথা তোকে কে শেখালে!

সুমন্ত বললে, আমাকে শেখাতে হবে কেন? একথা তো সবাই জানে, সবাই বলাবলি করে একথা আমাকে পাড়ার সবাই বলে সুদখোরের নাতি।

অনিলা বললে, লোকের কথায় তুই কান দিস নে বাবা। আমার কথা যদি একটু ভাবিস। মাথার ওপরে তোর বাবাও নেই, তুমি যদি আবার তোর বাবার মত করিস তাহ'লে আমি কী করবো বল? আমি কোথায় দাঁড়াবো? কে আমায় দেখবে? আমি কার ভরসায় বেঁচে থাকবো? তুই ছাড়া আমাব আর কে আছে পৃথিবীতে বল্? নিজের বাপের বাড়ি বলতে লোকের একটা যাবার জায়গা থাকে, আমার তা-ও নেই। তুই-ই আমার বল্-ভরসা বলতে যা কিছু। এখন তুই-ই যদি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিস, তাহ'লে আমি কার মুখ চেয়ে বাঁচবো বলতে পারিস? তোর কথা ভেবে-ভেবে আমি সারাদিন কিছু মুখে দিতে পারিনি, আমার সারাদিন উপোস করে কাটছে, তা জানিস?

সুমন্ত বললে, তা তুমি যখন দেখলে আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে, তখন তুমি নিজে খেয়ে নিলেই পারতে!

অনিলা বললে, তুই পেটের ছেলে হয়ে আজ আমাকে এই কথা বললি? তুই খাসনি, আর আমি তোর মা হয়ে খাবো?

বলে ছেলের সামনেই ঝর-ঝর করে কাঁদতে লাগলো।

সুমন্ত আর দাঁড়ালো না। নিজের ঘরের দিকে চলতে চলতে-বলল, যা দু' চক্ষে দেখতে পারি না, তাই-ই হয়েছে। তুমি কী ভেবেছ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তোমার ওই মড়া-কান্না দেখলেই আমার চলবে? আমার অন্য আর কোনও কাজ-কর্ম নেই?

—ওরে খোকা, শোন্, খোকা শোন্—

সুমন্তও বোধহয় ঠিক তার বাপের ধারা পেয়েছিল। সে মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা দড়াম্ করে শব্দ করে ভেতর থেকে খিল দিয়ে দিল।

এই-ই ছিল অনিলার সাংসারিক জীবন। বড়লোক শ্বশুর-বাড়িতে বউ হয়ে যখন সে গিয়েছিল, তখন পাড়ার লোক, গাঁয়ের লোক তাকে কত হিংসে করেছিল। সবাই বলেছিল—অনিলা আগের জন্মে অনেক পুণ্য করেছিল, তাই এমন রাজরাণী হতে পারলো!

রাজরাণী! হ্যাঁ, রাজরাণীই বটে! রাজরাণী হয়েছিল বলেই আজ তাকে এমন করে জেল খাটতে হচ্ছে।

সুশীলা সেদিন একটা মাছভাজা নিয়ে লুকিয়ে এনে দিলে।

বললে, আপনি এই মাছভাজাটা খান দিদি!

অনিলা অবাক হয়ে গেল! বললে, তুমি আবার আমার জন্যে মাছভাজা আনতে গেলে কেন সুশীলা! আমি কী মাছভাজা খাই?

সুশীলা বললে, অনেক বলে-কয়ে তবে ওটা এনেছি আপনার জন্যে আপনি আর ক'টা দিন পরেই তো চলে যাচ্ছেন, তখন বাড়িতে গিয়ে অনেক ভালো-ভালো খাবার খাবেন।

অনিলা বললে, কিন্তু আমি যে বিধবা সুশীলা, আমায় কী মাছ খেতে আছে?

সুশীলা প্রথমটায় একটু লজ্জায় পড়লো। তারপর বললে, তাহ'লে কালকে আমি আপনার জন্যে রসগোল্লা এনে দেব!

অনিলা বললে, রসগোল্লায় আমার দরকার নেই, কিন্তু তোমাদের এখানে জেলের ভেতরে রসগোল্লাও পাওয়া যায় নাকি?

সুশীলা বললে, সব পাওয়া যায়, শুধু মুখ ফুটে বলুন না কী চাই আপনার? এখানে যাদের মদের নেশা, তাদের জন্যে মদও আসে।

—পয়সা কে দেয়?

—পয়সা বাড়ির লোক, যারা কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে আসে তারাই লুকিয়ে দিয়ে যায় আপনার বাড়িতে কে আছে বলুন, আমি এখুনি সেই বাড়ির লোকদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বলুন না, বাড়িতে কে-কে আছে?

অনিলা কী করে জানবে এখন বাড়িতে কে আছে। সুমন্তর যখন ষোল বছল বয়েস তখন সে বাড়ি থেকে চলে এসেছে। আর সেই যে এসেছে, তারপর থেকে আর কেউই কখনও তার সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে আসেনি। এই আট বছরের মধ্যে সুমন্ত একবার খবর নিতেও আসেনি যে মা কেমন আছে, কিংবা বেঁচে আছে কিনা?

অথচ সুমন্তর জন্যে অনিলা কি-ই-না করেছে। ছেলের জন্য সমস্ত মায়েরাই এমন করে। কিন্তু সব মায়েরা কী অনিলার মত জেল খাটে?

মনে আছে, যেদিন বসন্ত বিশ্বাসের মৃতদেহটা বাড়িতে আনা হয়েছিল, তখন বাড়ির

সামনে গ্রামসুদ্ধ লোকের ভিড় হয়েছিল। তখন ওই সুমন্ত ছোট। বাইরে তখন মানুষের ভিড়ে পা রাখবার জায়গা ছিল না। আর অনিলা তখন নিজের ঘরের বিছানার ওপর সুমন্তকে বুকের মধ্যে গুঁজে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে।

ভোলার মা এসে ডাকছিল—বউদি, কর্তাবাবু তোমাকে একবার ডেকেছে—

তবু কোন উত্তর দেয়নি অনিলা। শেষকালে হেমন্ত বিশ্বাস একেবারে নিজে এসে ডেকেছিল—বউমা, এসো-এসো, একবার শেষ দেখা দেখে সেরে যাও—তখন যেমন আমার কথা কানে নেয়নি, এখন যা হবার তাই-ই হয়েছে।

অনেক ডাকাডাকির পর অনিলা সুমন্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে এসে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। সে তো শেষ দেখা নয়, যেন শেষ দর্শন। কিন্তু মনে আছে যেন কিছুই দেখতে পায়নি সে। চোখের জলে সবাই ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। শুধু যেন একটা রক্তপিণ্ড দাউ-দাউ করে জ্বলছিল তার চোখের সামনে আর তারপর জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ আর একদিন এমনি হলো।

সে-দুর্ঘটনার পর তখন অনেক দিন কেটে গেছে। বোধহয় হেমন্ত বিশ্বাসও নিজের সম্পত্তির গরমে পুরোনো কথা সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। আবার একদিন সদর খটখট শব্দ।

—কে? কে কড়া নাড়ছে?

বাইরে থেকে শব্দ হলো, আমরা সদর থানা থেকে আসছি।

সদর থানা থেকে লোক আসা মানে যে-কী, তা হেমন্ত বিশ্বাস ভালো করেই জানতো। তাই ধড়মড়িয়ে উঠে সদর-দরজা খুলে দিয়েছে।

দ্যাখে সামনেই পুলিশ আর পুলিশের দারোগা দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে টর্চ ছিল বলে তাদের আসল চেহারা দেখা গেল। তাদের দেখেই বুকটা ধড়াস করে একবার কেঁপে উঠলো হেমন্ত বিশ্বাসের।

তবু সঙ্কোচে বললে, কী চাই?

—আপনার নাম কি হেমন্ত বিশ্বাস?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ হুজুর।

—আপনি এ-গ্রামের মহাজন?

হেমন্ত বিশ্বাস আবার বললে, আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর।

—সুমন্ত বিশ্বাস আপনার কে হয়?

—আমার নাতি।

দারোগাবাবু বললে, আমরা আপনার বাড়ি সার্চ করবো।

হেমন্ত বিশ্বাস ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না।

আরো স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যে সদর থানার দারোগাবাবু বললে, আপনার নাতিকে ডাকাতি করবার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে এখন আমাদের হাজতে আছে। আপনার ছেলে বসন্ত বিশ্বাস কি নকশাল ছিল?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ।

দারোগাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলে, সেই বসন্ত বিশ্বাস কী পুলিশের সঙ্গে গুলি চালাচালিতে মারা যায়।

। হ্যাঁ।
—সুমন্ত বিশ্বাস কি তারই ছেলে ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ।
দারোগাবাবু বললে, তাহ'লে আপনার বাড়ি তল্লাসী করবো।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, করুন, তল্লাসী করুন।
মনে আছে, পুলিশ এসে সমস্ত বাড়ি একেবারে তল্লাসী করে তছনছ করে গিয়েছিল সেদিন ? অনিলারও সেদিন বুকটা ভয়ে দুর-দুর করে কেঁপে উঠেছিল। ঠিক এই রকম কাণ্ডই ঘটেছিল কয়েক বছর আগে যখন তার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিল পুলিস। পুলিস তো কোনোদিন সুসংবাদ নিয়ে আসে না।
হেমন্ত বিশ্বাস পুলিসকে জিজ্ঞেস করেছিল, সুমন্ত বেঁচে আছে তো ?
পুলিশ বলেছিল, হ্যাঁ বেঁচে আছে, তবে ডাকাতির অপরাধে সে এখন আমাদের হেফাজতে আছে।
হেমন্ত বিশ্বাস বিশ্বাসই করতে চায়নি যে সুমন্ত কোনও দিন ডাকাতি করতে পারে। বললে, কিন্তু সে আমার নাতি, আমার তো টাকার অভাব নেই সে কেন ডাকাতি করতে যাবে ? কোথায় ডাকাতি করেছিল সে ?
দারোগা বললে, আমরা তা জানি না। আমাদের ওপর হুকুম এসেছে ওপর থেকে। বোধহয় নক্‌শালপন্থীদের দলে ছিল আপনার নাতি। তারপর বসন্ত বিশ্বাসও তো পুলিসের সঙ্গে গুলির লড়াইতে মারা যায় ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কিন্তু সে তো বারো বছর আগের ঘটনা।
অনিলা সেদিন হঠাৎ এই বিপর্যয়ে যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। সে তখন দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। তার বিছানা, আলমারি, তোরঙ্গ, তার সবকিছু ওলোট-পালট করে ফেলেছিল। আর শুধু শোবার ঘরই নয়, সমস্ত বাড়িটা তোলপাড় করে দিয়েছিল পুলিস।
শেষকালে হেমন্ত বিশ্বাসের ঘর। যে-ঘরে শ্বশুরের সিন্দুক থাকে।
পুলিস বললে, সিন্দুকের তালাটা খুলুন।
হেমন্ত বিশ্বাস সিন্দুকের তালা খুলতেই দেখা গেল অনেক গয়না, অনেক টাকা অনেক তমসুক, অনেক খাতা-পত্র। গয়নার পাহাড় দেখে পুলিসের চোখগুলো চক-চক করে উঠলো।
পুলিস জিজ্ঞেস করল, এ-সব এত গয়না কীসের ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, এসব একটাও আমার নয়, সমস্ত গাঁয়ের লোকদের। আমি বন্ধকী কারবার করি, তারা এগুলো আমার কাছে বন্ধক রেখে গেছে। তার বদলে তাদের টাকা দিয়েছি। গরীব লোকদের টাকা দিয়ে আমি তাদের উপকার করেছি। টাকা ফেরত দিলেই আমি আবার এ গয়নাগুলো ফেরত দিয়ে দেব।
দারোগা বললে, তাহ'লে আপনি তো একজন মহাজন, সুদখোর এই জন্যেই আপনার ছেলে-নাতি এইরকম হয়েছে।
হেমন্ত বিশ্বাসের কানে কথাটা বড় খারাপ লাগলো। বললে, তা মহাজন হওয়াটা কি খারাপ ? আমি মহাজনি করি বলেই তবু এখানকার গরীব-গুর্বো লোকেরা খেয়ে-দেয়ে একটু বেঁচে আছে।

পুলিস এরপর আর কিছু বললে না। কিছু না পেয়ে খালি হাতেই চলে গেল। কিন্তু অনিলার মনের ভাবনা তবু ঘুচলো না। কোথায় রইল সুমন্ত ! কেন সে ডাকাতির দলের সঙ্গে মিশলো ! কেমন আছে, কেমন আছে সে ? কবে তাকে পুলিশ ছেড়ে দেবে।

সবাই চলে যাবার পর হেমন্ত বিশ্বাস কাছে এল।

বললে, বউমা আমি তোমাকে বলিনি যে ছেলেকে এত আদর দেওয়া ভালো নয় ! এখন হলো তো ? তোমার আদর পেয়ে-পেয়েই সুমন্ত এমনি হলো। বড্ড আদর দিয়ে দিয়েই তুমি ছেলের এই সর্বনাশ করলে ! এখন ঠ্যালা বোঝ ! আমার আর কী ? আমি চলে গেলে তখন একলা তোমাকেই এই সব সহ্য করতে হবে। আমার এই জমি-জমা-ক্ষেত-খামার আমার এই টাকা-কড়ি গয়না-গাঁটি সব খোয়াবে, তখন তোমাকেই পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। তখন বুঝবে আমি যা বলতুম সব ঠিক বলতুম।

যা হোক শেষকালে একদিন সুমন্ত এল। আসতেই হেমন্ত বিশ্বাস দৌড়ে নাতির কাছে এসেছে। বললে, কী রে, কী হয়েছিল ?

সুমন্ত বললে, কিছুই হয়নি !

—কিছুই হয়নি মানে ? তাহ'লে পুলিস এসে কী মিছে কথা বলে গেল ভেবেছিস ? তারা যে বললে, ডাকাতের দলে ছিলি তুই ?

সুমন্ত বললে, সব বাজে কথা !

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বাজে কথা হলে পুলিস তোর মাকে আর আমাকে সেদিন বাড়ি এসে অপমান করলে কেন ?

সুমন্ত বললে, পুলিস কী করে গেল তা আমি কি জানি ? আমি কেন ডাকাতি করতে যাবো ?

—তুই যদি ডাকাতি না করতে যাবি, তাহ'লে কোথায় গিয়েছিলি তাই বল্ !

সুমন্ত বললে, আমি কোথায় গিয়েছিলুম তার জবাবদিহি আমি তোমাকে দিতে যাবো কেন ?

বলে আর দাঁড়ালো না, সোজা ঘরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল !

অনিলাও এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। এবার তার নিজের কাজে মন দেবার জন্যে চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস তাকে যেতে দিলে না।

বললে, শোন বউমা, যেও না—

অনিলা থমকে দাঁড়ালো।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, দেখ বউমা, তোমার আদর পেয়ে পেয়েই সুমন্ত এত আস্কারা পেয়েছে। তুমি বসন্তকেও শাসন করতে পারোনি বলে তার ওই দুর্দশা হয়েছিল, এখন সুমন্তও তোমার কাছ থেকে লাই পেয়ে-পেয়ে বাপের পথ ধরেছে। গুরুজনদের যারা শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে জানে না, তাদের এই দুর্দশাই হয় ! যা হোক, আমি এখন আবার তোমাকে বলে রাখছি। আমি তোমাকে এখন থেকে সাবধান করে রাখছি। আমাকে এত অগ্রাহ্য করার শাস্তি তোমাদের আমি দেবোই—বলে রাগে গর্-গর্ করতে করতে হেমন্ত বিশ্বাস নিজের কাজে চলে গেল।

সেদিন হঠাৎ জেলার সাহেব অনিলাকে তার অফিসে ডেকে পাঠালো।

সুশীলা খুব খুশী। বললে, আমি বলেছিলাম দিদি যে এবার আপনাকে ছেড়ে দেবার হুকুম হবে!

তারপরে একটু থেমে আবার বললে, জেলখানা থেকে চলে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবেন না যেন দিদি।

তারপরে একটু থেমে আবার বললে, জেলখানা থেকে চলে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবেন না যেন দিদি।

অনিলা বললে, জানিনা বাড়িতে গিয়ে কি দেখবো। কতদিন পরে নিজের বাড়ি যাচ্ছি। তুমি বুঝতে পারবে না সুশীলা, আমার ছেলের জন্যে কেমন করছে! তোমার যদি ছেলে থাকতো, তাহলে তুমিও বুঝতে পারতে!

সুশীলা বললে, কিন্তু আপনার ছেলে তো একবারও আপনাকে এখানে দেখতে এল না দিদি—

অনিলা বললে, তাই তো ভাবছি, অসুখ-বিসুখও তো হতে পারে! আমার মনে এখন কেবল ছেলের চিন্তাই হচ্ছে। সে কি করে দিন কাটাচ্ছে, কী খাচ্ছে! কেউ তো এখন আর তাকে দেখবার নেই!

জেলারের সামনে সুশীলাই নিয়ে গেল অনিলাকে।

জেলার সাহেব লোক ভালো। সামনের চেয়ারে বসতে বললে।

বললে—দেখ, ওপর থেকে হুকুম হয়েছে তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে। তোমার যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল, কিন্তু তোমার রেকর্ড ভালো বলে তোমাকে আট বছরের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তুমি খুশী তো?

অনিলা মুখে কিছু বললে না, শুধু একটু ম্লান হাসি হেসে তার সম্মতি জানালো।

জেলার সাহেব তার দিকে কয়েকটা নোট এগিয়ে দিয়ে বললে, এই টাকা নাও, তোমার গাড়িভাড়ার জন্যে। আর এইখানটায় তোমার নামটা সই করে দাও। তুমি নাম-সই করতে পারো তো?

অনিলা বললে, হ্যাঁ—

জেলার সাহেব নিজের কলমটা এগিয়ে দিলে। অনিলা সেটা দিয়ে নিজের নামটা যথাস্থানে সই করে দিলে।

তারপরেই ছুটি। নিজের আগেকার পরা থান ধুতিটা পরে জেলের পোষাক বদলে ফেললে। সুশীলা কোথা থেকে একটা সাবান আর একটু সরষের তেল এনে দিলে।

বললে, এ চেহারা নিয়ে বাড়ি যাবেন না দিদি, মাথায় তেল দিয়ে সাবান মেখে চান করে নিন, তারপরে যান—

অনিলা তাই-ই করলে। তারপর সুশীলা তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। অনিলা তখন নিজের ভাবনাতেই অস্থির। তবু বললে, আমি আর মুখে কী বলবো সুশীলা, তুমি এই ক' বছর আমার জন্যে অনেক করেছ, যা করেছ সমস্ত আমার মনে

থাকবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো বাড়ি গিয়ে যেন সব ভাল আছে দেখতে পাই—
সুশীলা বললে, ভালোই দেখতে পাবেন দিদি। আপনি যেমন ভালো, আপনার কপালও তেমনি ভালো। আপনার কোনও খারাপ হতে পারে না!
হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠে বসেছিল অনিলা। সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার ভেতরে আরো অনেক লোক। ভীড় খুব। তারা কেউ জানতেও পারছে না যে তাদের মধ্যে একজন খুনী আসামীও চলেছে। গায়ে সাবান দিয়েছে। আসামীর কোন চিহ্ন তার গায়ে লেখা নেই।
ঝক্-ঝক্ শব্দ করতে করতে ট্রেনটা চলেছে। শব্দের তালে-তালে অনিলার পুরোনো কথাগুলো মনে পড়তে লাগলো।

হেমন্ত বিশ্বাস সাবধান করে দিয়েছিল যে সে বউমা আর নাতিকে একদিন শিক্ষা দেবে! তাই-ই দিলে হেমন্ত বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত।
কথাটা হঠাৎ একদিন অনিলার কানে গেল। কথাটা ভোলার মা কোথা থেকে শুনে এসেছিল কে জানে! সে এসে হঠাৎ একদিন চুপি-চুপি বললে, শুনেছ মা, কর্তাবাবু নাকি আবার বিয়ে করবে?
কথাটা শুনে অনিলা যেন আকাশ থেকে পড়লো।
বললে, কোথা থেকে শুনলে তুমি?
ভোলার মা বললে, কোথা থেকে আবার শুনবো, গাঁয়ের সবাই বলাবলি করছে। দিনক্ষণও নাকি ঠিক হয়ে গেছে—
অনিলা বললে, কই, আমি তো শুনিনি কিছু—
সত্যিই প্রথম দিকে অনিলা এ-ব্যাপারে কোনও মাথা ঘামায়নি। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, ততই আরো অনেক লোক তাকে এসে ঘটনাটা বলে গেল। বিশেষ করে পাড়ার কিছু মেয়েছেলে।
একজন বুড়ী এসে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ বউমা, তোমার শ্বশুর নাকি আবার বিয়ে করছে?
অনিলা বললে, কই, আমি তো কিছু শুনিনি দিদিমা—
কথাটা না শুনলেও সেটা যে সত্যিই তা কিছুদিন পরেই টের পাওয়া গেল।
হেমন্ত বিশ্বাসকে যেমন রোজ আফিমের ড্যালা আর দুধ দিতে যেতে হয়, তেমনি সেদিনও গিয়েছিল অনিলা।
হেমন্ত বিশ্বাস রোজকার মত আফিমের ড্যালাটা অনিলার হাত থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলে। তারপর গরম দুধের বাটিটাতে চুমুক দিয়ে খালি বাটিটা অনিলার হাতে দিতেই অনিলা সেখান থেকে রোজকার মত চলে আসছিল। কিন্তু তার আগেই হেমন্ত বিশ্বাস বলে উঠলো—বউমা, যেও না, শোন—
অনিলা দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে, আমাকে কিছু বলবেন বাবা?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, হ্যাঁ, বউমা, তোমাকে একটা কথা বলবো, মন দিয়ে শোন—

অনিলা দাঁড়িয়ে রইল। হেমন্ত বিশ্বাস বললে, আসছে বুধবার দিন তোমার একজন নতুন শাশুড়ী আনছি বাড়িতে। তুমি কিছু শুনেছ?
অনিলা স্পষ্ট মিথ্যে কথাই বললে—না।
—কেউ কিছু বলেনি তোমাকে! গাঁয়ের সবাই জানে, আর তোমার কানে কিনা কেউই তুললে না? আশ্চর্য তো? হ্যাঁ, আমি আবার একবার বিয়ে করছি। ভয় পেও না। খুব ভালো মানুষ, স্বভাব-চরিত্র-বংশ সমস্ত কিছুর খবরই আমি নিয়েছি। কোথাও কোন খুঁত নেই। বাপের পয়সা-কড়ি তেমন নেই। তা না থাক, আমার তো পয়সা-কড়ি আছে। শ্বশুরবাড়ির টাকা নিয়ে কী আমি ধুয়ে খাবো? আমার যা টাকা-কড়ি আছে তাই-ই কে খায় তার ঠিক নেই, পরের যৌতুকের টাকায় আমার দরকার কি?
অনিলা শ্বশুরের কথার ওপর কোনও মন্তব্য করলে না।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কই তুমি কিছু বলছো না যে বউমা!
অনিলা বললে, আমি আর কী বলবো বাবা?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তবু তুমি তো কিছু বলবে!
অনিলা বললে, আমার আর কী বলবার থাকতে পারে! আপনি নিজে যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না, তোমাকে বলছি এই জন্যে শেষকালে তুমি আবার না বলতে পারো যে, তোমাকে না বলেই বিয়ে করেছি!
অনিলা এ-কথারও কোনও জবাব দিলে না। অনিলা ভেবেছিল শ্বশুরের যা বলবার তা বুঝি বলা শেষ হয়ে গেছে, তাই সে চলে আসছিল। কিন্তু হেমন্ত বিশ্বাস আবার তাকে ডাকলে।
বললে, যেও না বউমা, আরো কথা আছে, শোন—
অনিলা দাঁড়িয়ে রইল। হেমন্ত বিশ্বাস বললে, কই, তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না যে, এই বয়েসে আমি আবার নতুন করে বিয়ে করছি কেন?
অনিলা সেই একই উত্তর দিলে, আমি আর কী বলবো? আপনি যা ভালো বুঝেছেন তাই-ই করছেন!
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, না, তা নয়, তুমিই বলো না আমি কী বিয়ে করে কিছু অন্যায় করছি? আমার এই কারবার, আমার এত টাকা-কড়ি, আমার এই এত বিরাট সম্পত্তি, এসব কার হাতে দিয়ে যাবো, তুমিই বলো? আমি কার জন্যে এত খেটে মরছি? আমার কী ছেলে আছে একটা? যে ছেলেটা ছিল তাকে সংসারী করবার জন্যেই তো তোমাকে বউ করে ঘরে এনেছিলুম, তা তুমি তো তা করতে পারলে না। তারপর একটা যে নাতি ছিল, ভেবেছিলুম তার হাতে সবকিছু তুলে দিয়ে আমি একটু বিশ্রাম নেব, আমি একটু নিশ্চিন্ত হবো, কিন্তু তা তো হলো না। নাতিটাও একটা অপোগণ্ড হয়ে জন্মালো। এখন তাহ'লে আমার নতুন করে বিয়ে করা ছাড়া আর গতি কী?
হেমন্ত বিশ্বাস অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে হাঁপাতে লাগলো।
অনিলা যখন দেখলে শ্বশুর আর কিছু বললে না তখন আস্তে-আস্তে দুধের খালি বাটিটা নিয়ে বাইরে চলে এল।

বুধবার। অনিলা গুণে দেখলে বুধবার আসতে আর মাত্র পাঁচটা দিন বাকি। পাঁচদিনের মধ্যেই হেমন্ত বিশ্বাস বিয়ে করতে যাবে! বাড়িতে তখন বরযাত্রীদের ভিড় লেগে যাবে!

সত্যিই তাই হলো। হেমন্ত বিশ্বাস বিয়ে করতে যাবে,বুধবার, বৃহস্পতিবার নতুন বউ নিয়ে এ-বাড়িতে আসবে। তারপর শুক্রবার হবে বউভাত। সেইদিন থেকেই অনিলা দেখলে বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। বেশ ঘটা করে বিয়ে হবে। গ্রামের মিঠু মোদক দই-মিষ্টির অর্ডার নিয়ে গেল। হেমন্ত বিশ্বাস তাকে আগাম দু'শো টাকা দিয়ে দিলে। বাড়ির সামনের উঠোনে সামিয়ানা খাটানো হবে। সেখানে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা খেতে বসবে।

সবই অনিলার কানে গেল।

গ্রামের ছোট-বড় সব সমাজের লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হলো। কোনও কিছু আয়োজনের ত্রুটি নেই। গাদা-গাদা বাঁশ এসে জড়ো হলো উঠোনের ওপর। মাছের বরাত গেল জেলে পাড়ায়। পাকা রুই মাছ দিতে হবে। যেন গ্রামের লোক খেয়ে বাহবা দিতে পারে হেমন্ত বিশ্বাসকে। বসন্ত বিশ্বাসের বিয়েতে যে-রকম মাছ দিয়েছিল, সে-রকম নয়। মোট তিন মণ মাছ হলেই চলে যাবে।

তারপর আছে মাংস। পাঠার মাংস। তাছাড়া দই, রসগোল্লা, পানতুয়াও করতে হবে। মিঠু মোদকের পুরনো খদ্দের হেমন্ত বিশ্বাস। বসন্তর বিয়েতে সে-ই মিষ্টি বানিয়েছিল। লোকে সে-সময় সে-মিষ্টির খুব তারিফ করেছিল। মিঠু বললে, সন্দেশ করবেন না কর্তামশাই?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, বলছো কী তুমি মিঠু? সন্দেশ না হলে বিয়ে হয়? ভালো কাঁচাগোল্লা করতে হবে তোমাকে মিঠু। এমন কাঁচাগোল্লা করবে যেন লোক চেয়ে-চেয়ে খায়। বসন্তর বিয়ের সময় তোমার কাঁচাগোল্লা ভালো হয়নি। এবার কিন্তু ভাল কাঁচাগোল্লা করে দিতে হবে তোমাকে।

মিঠু বললে, আজ্ঞে কর্তামশাই, ছানার দাম কিন্তু আগের চেয়ে চড়া!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তা চড়া দামই হোক আর যা-ই হোক, কাঁচাগোল্লা না হলে তো বউভাত হয় না। লোকে বলবে কী? আমার কী টাকার অভাব বলতে চাও?

মিঠু আর কিছু বললে না। আগাম দু'শো টাকার বায়না নিয়ে সে চলে গেল।

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, শুক্করবার সব দই-মিষ্টি আমার বাড়িতে সকালবেলা হাজির করে দেবে, তখন সব টাকা নগদ হাতে হাতে পেয়ে যাবে। বুঝলে? তুমি তো জানো আমার কাছে ধারের কোনো কারবার নেই।

হেমন্ত বিশ্বাস সোমবার থেকে পাড়ায়-পাড়ায় নিজে গিয়ে নেমতন্ন সেরে এল। বললে, যাওয়া চাই কিন্তু মল্লিকমশাই, কোনও ওজর-আপত্তি শুনবো না।

বামুন পাড়ার মহেন্দ্র চক্রবর্তীমশাই শুধু বললেন, বেশ তো ছিলে হেমন্ত, আবার কেন বিয়েতে জড়িয়ে পড়ছো, এ বিয়েটা কী না করলেই চলছিল না?

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, আপনি তো সবই জানেন চক্কোত্তিমশাই, আমার যদি একটা উপযুক্ত ছেলে থাকতো তো তাহ'লে কী আর এই ঝঞ্ঝাট করতাম?

—কেন, তোমার নাতি? সুমন্ত? বরং তার বিয়েটা দিয়ে দাও না!

হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তার কথা আর বলবেন না চক্কোত্তিমশাই, সে একটা

অপোগণ্ডের একশেষ, সে রাত্তিরে রোজ বাড়িতেই আসে না।
—তা তারই না হয় একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। বিয়ে দিয়ে দিলেই ছেলেরা জব্দ।
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, তাহ'লে কী আর ভাবনা ছিল চক্কোত্তিমশাই? আমি তো বসন্তর বিয়ে দিয়েছিলাম সেইজন্যে, ভেবেছিলাম বিয়ে দিলে ছেলে ঘরমুখো হবে। কিন্তু তারপর যা হলো, তা তো আপনারা সবই জানেন। সেই জন্যেই তো আবার এই ঝামেলা করছি। নইলে কি বিয়ে করতে আমার এত সাধ?
সোমবারটা কাটলো। মঙ্গলবার সারা দিনই নিজের বিয়ের ব্যাপারে মেতে রইল হেমন্ত বিশ্বাস। বিকেলবেলার দিকে হেমন্ত বিশ্বাস যখন বাড়ি ফিরে এল তখন আফিম খাবার সময় পার হয়ে গেছে। আফিম এমনই এক বস্তু যা বরাবর সময় মেনে চলে। একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। সময়ের একটু ঊনিশ-বিশ হলেই মানুষের মেজাজ বিগড়ে দেয়। মঙ্গলবার হেমন্ত বিশ্বাসেরও তাই হয়েছিল। বাড়িতে এসেই দরজা থেকে ডাকলে, বউমা—
বউমা আফিম নিয়ে তৈরিই ছিল। আর সঙ্গে গরুর দুধ।
অনিলা শ্বশুরের কাছে আফিমের কৌটোটা নিয়ে গেল। হেমন্ত বিশ্বাস তা থেকে একটি ড্যালা বার করে মুখে পুরে দুধের জন্যে হাত বাড়ালো।
অনিলা দুধের বাটিটা হেমন্ত বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে দিলে। এক চুমুকে দুধটা খেয়ে ফেলে অনিলার দিকে বাটিটা বাড়িয়ে ধরলে।
এ নিয়মটা বরাবরের। হেমন্ত বিশ্বাস এই বিকেলবেলা একবার আফিম খাবে, আর একবার রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার আগে।
দুধটা খাওয়ার পর বললে, বউমা, যেও না শোন, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—
অনিলা বললে, বলুন কী কাজ?
হেমন্ত বিশ্বাস বললে, গায়ে হলুদের তত্ত্বের ব্যাপারে তোমাকে একটু খাটতে হবে, তুমি ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই। জিনিসপত্র সব আমার কেনা-কাটা হয়ে গেছে। যারা গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে যাবে তারা কাল সকাল দশটার মধ্যেই এসে যাবে, তাদের জন্যে জল-খাবারের ব্যবস্থাটা তোমাকেই করতে হবে। আমার তো আর কেউ নেই। কুড়ি জন লোক খাবে। মিঠু মোদক কাল ভোরবেলা আমার বাড়িতে কচুরী-সিঙাড়া-রসগোল্লা পাঠিয়ে দেবে। তোমাকে একটু আগে থেকে বলে রাখলাম, যাতে তোমার কোনো কষ্ট না হয়—বুঝলে?
অনিলা বললে, হ্যাঁ—
হেমন্ত বিশ্বাস যেন একটু কৈফিয়তের সুরেই বললে, তোমাকে একটু কষ্ট দিচ্ছি বউমা, কিন্তু কী করবো বলো, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ যে নেই। তোমার কষ্ট একটু কমবে। তখন আর তোমাকে একলা এত খাটুনি খাটতে হবে না। আচ্ছা, তুমি এখন যাও—
তারপর আর সেখানে দাঁড়ায়নি অনিলা। সোজা নিজের ঘরে চলে এসেছিল। কাল শ্বশুরের বিয়ে। খানিকক্ষণ নিজের বিছানাটায় বসে নিজের মনেই একটু ভাবলো। কাল বুধবার। পরশু বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যের মধ্যেই তার নতুন শাশুড়ী বাড়িতে এসে যাবে। গ্রামের লোকজন, মেয়ে-পুরুষ নতুন শাশুড়ীকে দেখতে আসবে! তারপর দিন শুক্রবার। শুক্রবার নতুন শাশুড়ীর বউভাত।

লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে বাড়িটা সেদিন। ভাবতে-ভাবতে অনিলার চোখ দু'টো কান্নায় ঝাপসা হয়ে এল। এ-বাড়ির বউ সে, তার মাথার ওপর আর একজন আসবে। তার ওপর কর্তৃত্ব করবে। শ্বশুরের যত জমি-জমা-ক্ষেত-খামার, টাকা-পয়সা গয়না-গাঁটি সমস্ত কিছুর মালিক হয়ে যাবে সেই শাশুড়ী। তারপর হয়ত একদিন নতুন শাশুড়ীর সন্তানও হবে। তারা একদিন এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তখন সুমন্তকে হয়ত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। তখন?
তখন যে তার কী অবস্থা হবে তা ভাবতেই অনিলা শিউরে উঠলো। সে আর অপেক্ষা করলে না। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর একেবারে সোজা চলে গেল ভাঁড়ার ঘরে। সেই ভাঁড়ার ঘরেই হেমন্ত বিশ্বাসের ক্ষেত-খামারের ছোট-খাটো জিনিসপত্র থাকে। ধানের বীজ, পাটের বীজ। পোকা মারবার বিষ, ফলিডল। কোদাল, ঝুড়ি, গাঁইতি, ফেলে-দেওয়া বিদেকাঠি, আর তারই পাশে পাটের গোছা। চাষীরা যে-সব ধান-পাট-সরষে-কলাই-মুগ-ছোলা হেমন্ত বিশ্বাসের কাছে বন্ধক রেখে যেত, সেই সব জমানো থাকতো তারই পাশে। ভাঁড়ার ঘরের ভেতরে ইঁদুর-আরশোলার বাসা। সে-সব অনিলাকেই পরিষ্কার করতে হতো মাঝে। সেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই অনিলা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো—ঠাকুর, তুমি আমার অপরাধ নিও না, আমি বড় আতুর, আমায় তুমি ক্ষমা করো—
মঙ্গলবার। মঙ্গলবার রাত্রিতেই ঘটনাটা ঘটলো।
চারদিকের গ্রামের কেউই টের পায়নি আগে। হঠাৎ কান্নার শব্দে আশেপাশের সব বাড়ি থেকে লোকজন দৌড়ে এসেছে বিশ্বাসবাড়িতে। কী হয়েছে? কী হয়েছে ওদের বাড়িতে?

সবাই এসে দেখলে হেমন্ত বিশ্বাসমশাই নিজের বিছানার ওপর শুয়ে ছটফট করছে। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো—কী হলো বউমা? তোমার শ্বশুর এমন ছটফট করছেন কেন?
অনিলা বললে, কী জানি, আমি তো ওঁকে দুধ খাইয়ে নিজের ঘরে শুতে গিয়েছি, হঠাৎ ওঁর চীৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়ে এসে দেখি এই অবস্থা—
কেউ বলতে পারলে না কী করে এমন সর্বনাশ হঠাৎ হলো। ডাক্তার এল, কবিরাজ এল, কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলে না। কোনও ওষুধ দেবার আগেই বিয়ের আগের দিনই অত টাকার সম্পত্তি, অত ক্ষেত, অত খামার, অত টাকা-পয়সা-গয়না-গাঁটি সব ফেলে রেখে হেমন্ত বিশ্বাস সজ্ঞানে অত সখের অত সাধের সংসার ছেড়ে চলে গেল।
ট্রেন থেকে নেমে স্টীমারে করে নদী পার হতে হয়। চারিদিকে কত লোকজনের ভিড়, কত লোকের কত চীৎকার গোলমাল। অনিলা স্টীমারের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।
স্টীমার থেকে তিন ক্রোশ হেঁটে তবে গ্রামে পৌঁছতে হয়। কিন্তু একটা সাইকেল

রিক্‌শা ভাড়া করে অনিলা আবার সেই আট বছর আগেকার ফেলে-আসা কুসুমগঞ্জে গিয়ে পৌঁছল।
রিকশা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অনিলা ঠিক বাড়িটার সামনে এসে বাইরের দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো।
'—ওরে খোকা, খোকা, ওরে—'
প্রথমে কেউ সাড়া দিলে না।
অনিলা আবাব ডাকলে—'খোকা ওরে খোকা—'
এতক্ষণে ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কে যেন জবাব দিলে—কে?
অনিলা বললে, সুমন্ত আছে? আমি তাব মা, আমি তার মা এসেছি, দরজাটা খুলে দাও—
দরজাটা খুলতেই অনিলা দেখলে একজন বউ, তার মাথায় সিঁদুর।
এ মেয়েটি আবার কে তার বাড়িতে?
অনিলা বললে, তুমি কে?
বউটিও বললে, আপনি কে?
অনিলা বললে, আমি সুমন্তর মা। এত বছর পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। জেল থেকেই সোজা এসেছি এখানে। সুমন্ত কোথায়।
মেয়েটি যেন একটু বিরক্তিকর সুরে বললে, বাড়িতে নেই, কলকাতায় গেছেন।
অনিলা জিজ্ঞেস কবলে, তা হলে তুমি? তুমি তার কে হও?
মেয়েটি বললে, আমি তার স্ত্রী।
অনিলা বললে, ও, তুমি আমার খোকার বউ? খোকা বুঝি বিয়ে করেছে? তাহ'লে তুমি তো আমার বউমা। আমি জেলখানায় ছিলুম বলে কিছুই খবর পাইনি বউমা। আমি তোমার শাশুড়ী হই বউমা! ভালোই হলো, আমি বড্ড ক্লান্ত হয়েছি। আমার বড় জল তেষ্টা পেয়েছে। অনেক দূর থেকে এসেছি। সেই সকাল ন'টার সময় বেরিয়েছি, এখনও পর্যন্ত মুখে এক ফোঁটা জলও দিইনি। দাঁড়াও, আগে বাড়ির ভেতরে ঢুকি, তারপর একটু জল খাবো—
বলে বাড়ির ভেতরে পা বাড়াতে যাচ্ছিল।
কিন্তু মেয়েটি রাস্তা আটকে দাঁড়ালো। বললে, ভেতরে ঢুকবেন না, যা বলবার ওইখানে দাঁড়িয়েই বলুন—
অনিলা থমকে দাঁড়ালো। বললে, বলছো-কী বউমা, আমি যে তোমার শাশুড়ী হই। আমাকে তুমি চিনতে না পারো, কিন্তু তোমার স্বামীকে যে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। আমার ছেলে ফিরলে দেখবে ছেলে আমাকে কত ভালোবাসে—
মেয়েটি বললে, তা জানি না, তিনি এখন বাড়ি নেই, আমি যাকে-তাকে অচেনা মানুষকে বাড়ি ঢুকতে দিতে পারি না—তিনি বললে তখন আপনি বাড়ি ঢুকবেন, তার আগে আমি আপনাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারবো না।
অনিলা বললে, তুমি বলছো কী বউমা, আমি উটকো লোক কেউ নই, আমি এ বাড়ির বউ, তোমার স্বামী আমার পেটের ছেলে—
মেয়েটি বললে, ওসব শুনে আমার কোনও লাভ নেই—
অনিলা বললে, কিন্তু তুমি না শুনলে চলবে কেন বউমা? তোমাকে যে শুনতেই

হবে আমার কথা। তুমি তাড়িয়ে দিলেও আমি তো তা বলে চলে যেতে পারিনা—তুমি আমাকে অপমান করলেও আমি আমার ছেলেকে ছেড়ে দিতে পারবো না—তুমি তো পরের বাড়ি থেকে এসেছ, তাই হয়ত তুমি সব জানো না—

মেয়েটি বললে, না, আমি সব শুনেছি। আপনি আমার দাদা-শ্বশুরকে বিষ খাইয়ে খুন করেছিলেন, তাই আপনার যাবজ্জীবন কারাবাস হয়েছিল। অনিলার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো।

বললে, তুমি আজ আমাকে এই কথা বললে বউমা? তোমাদের সুখের কথা ভেবেই তো করেছিলুম। সেদিন যদি তাঁকে খুন না করতুম তা হলে কী আজ তুমি এই সংসার করতে পারতে? এত সম্পত্তির মালিক হতে পারতে? এত আরামে এই বাড়িতে বাস করতে পারতে?

মেয়েটি বললে, সে-সব কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই, আমি খুনীকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে পারি না—বলে অনিলার মুখের সামনেই মেয়েটি দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলে।

অনিলা আর্তনাদ করে উঠলো—বউমা শোনো, শোনো, একবারটি দরজাটা খোলো—কিন্তু ততক্ষণে পাড়ার আরো কিছু লোক শব্দ শুনে জড়ো হয়েছে দৃশ্যটা দেখতে। অনিলা তখন সেখানে সেই দরজার সামনে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে মূর্ছা গেছে। তার তখন আর হুঁশ নেই!

যে ভদ্রলোক আমাকে গল্পটা বলছিলেন, তিনি এবার থামলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

ভদ্রলোক বললেন, আপনি যদি কখনও কাশীতে মা-আনন্দময়ীর আশ্রমে যান তো দেখতে পাবেন সেই অনিলা দেবী এখনও বেঁচে আছেন। অনেক কষ্ট পেয়েছেন তিনি জীবনে, ভেবেছিলেন শ্বশুরের মৃত্যুর পর জেল থেকে বেরিয়ে যে-কটা দিন বাঁচেন, তাতে শান্তিতে পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে সংসার করবেন। কিন্তু তা বোধহয় বিধাতার বাসনা নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু অনিলা দেবী শ্বশুরকে খুন করলেন কী করে?

ভদ্রলোক বললেন, সেটা আদালতেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যখন আদালতে মোকদ্দমাটা উঠেছিল। বুধবার ছিল হেমন্ত বিশ্বাসের বিয়ের তারিখ। আর অনিলা মঙ্গলবার রাত্রেই আফিম খাবার পর শ্বশুরকে যে দুধ খেতে দিয়েছিল, সেই দুধের সঙ্গে 'ফলিডল' মিশিয়ে দিয়েছিল।

এও এক রাণীর কাহিনী। কিন্তু এ এক অন্য ধরনের রাণী।
এ আমি কার কাহিনী লিখতে বসেছি ? অটলদার, ইন্দুলেখার না কুন্তি দেবীর ?
ভুল সব মানুষই করে। কিন্তু সেই ভুলের খেসারত এমন মর্মান্তিকভাবে ক'জন দিতে পারে অটলদার মত। অটলদার ছিল না কী ? বিদ্যা ছিল, স্বাস্থ্য ছিল। অন্য সব সাধারণ মানুষের যা থাকে না—তাই-ই ছিল। কিন্তু তবু কোন্ ভুলের জন্যে সবকিছু গুণ ব্যর্থ হলো এমন করুণভাবে। আর ইন্দুলেখা দেবী ?
স্ত্রী অনেকেরই থাকে। আবার অনেকেরই থাকে না। কিন্তু এমন স্ত্রীই-বা ক'জন পায় অটলদার মত। কারো স্ত্রী স্বামীর প্রতিভাকে সম্মান করে। কারো স্ত্রী স্বামীর সংসারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেউ স্বামীর সব দোষ-ত্রুটি ক্ষমা দিয়ে আড়ালে করে, কেউ অবহেলা দিয়ে স্বামীকে পীড়ন করে। সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে কত জটিল উপন্যাসই লেখা হয়েছে। কিন্তু এমন কাহিনীই-বা-ক'টা উপন্যাসে পাওয়া যায় ? আর ইন্দুলেখা দেবীর মত এমন স্ত্রীই-বা ক'জন স্বামী পায় ? আবার এমন স্ত্রী পেয়ে এমনভাবে অবহেলাই-বা করে ক'জন স্বামী ?
তাই বলছিলাম, এ আমি কার কাহিনী বলতে বসেছি ? অটলদার ইন্দুলেখার না কুন্তি দেবীর ?
মনে পড়ে—বিয়ের দিনই ঘটনাটা ঘটলো।
যখন থেকে ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করেছি তখন বেশ বয়েস হয়েছে। কিন্তু তার আগে ? তার আগেকার জীবনটা মনে করতে গিয়ে অনেক সময় হাঁপিয়ে উঠি। হঠাৎ কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে মুস্কিলে পড়ি। কী যেন নাম, কী যেন পরিচয়। কোথায় যেন দেখেছি, চেনা-চেনা মুখ—আর কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু শুধু এইটুকু মনে আছে যে, বিয়ের দিনই ঘটনাটা ঘটলো।
জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী কোনোদিন বাদামতলায় থাকতেন ?
মহিলাটি কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন প্রশ্নটা শুনে।
এক-একজন ক'রে আসছিলেন আর কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যথারীতি চলে যাচ্ছিলেন। গার্লস-স্কুলের টিচার-সিলেক্শান চলছিল। অনেকগুলো দরখাস্ত এসেছিল। বি-এ পাস করা সবাই। সবাই কিছু কিছু অন্য স্কুলে পড়িয়েছেন। এক-এক করে সবাইকে পরীক্ষা করার ভার পড়েছিল আমার ওপর। স্থায়ী সেক্রেটারী ভুবনবাবু ছুটিতে। যাবার আগেই বলেছিলেন, দেখবেন, ম্যারেড-টিচারকেই প্রেফারেন্সটা দেবেন, মানে, আন্-ম্যারেডরা আবার কাজকর্ম শিখে শেষে বিয়ে ক'রে চাকরি ছেড়ে দেয় কিনা।
স্কুলের কমিটিরও তাই মত। আমি নতুন পাড়ায় বাড়ি ক'রে উঠে এসেছি। ভুবনবাবু আমার পুরানো বন্ধু। কমিটির মেম্বাররা সবাই খাতা-পত্র দরখাস্তগুলো দিয়ে বলেছিলেন, পনেরো জন ক্যান্ডিডেট, এঁদের মধ্যে একজনকে আপনি বেছে নেবেন।
বললাম, শেষকালে আমাকে এই ভার দিচ্ছেন—আপনারা কেউ একজন থাকলে হতো সঙ্গে ?

শেষ পর্যন্ত একলাই আমাকে থাকতে হলো। ভুবনবাবুই স্কুল, ভুবনবাবুই সর্বেসর্বা। তিনিই মোটা টাকা দিয়ে স্কুল করেছেন—বলতে গেলে তাঁর একলারই স্কুল।

ভুবনবাবু বললেন, আপনি এ-পাড়ার লোকদের চেনেন না মশাই, এখানে ভীষণ দলাদলি।

যাহোক্, পরীক্ষার দিন একলাই সকলকে ইন্টারভিউ দিচ্ছি। ভুবনবাবুর স্বর্গীয় স্ত্রী ঊর্মিলা দেবীর নামে স্কুলটা। পঁচাত্তর টাকা বেসিক মাইনে, বছরে তিনটাকা ইন্‌ক্রিমেণ্ট, বেড়ে-বেড়ে দশ বছরে একশো পাঁচে গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর কোয়ার্টার্স ফ্রি, দৈনিক আট আনা টিফিন। পুজোর সময় সমস্ত টিচারদের পঞ্চাশ টাকা পুজা-গিফ্‌ট্। অনেকরকম সুযোগ-সুবিধে ঊর্মিলা বালিকা বিদ্যালয়ের চাকরিতে। সবই ভুবনবাবুর দান। ইউনিভার্সিটির গ্র্যাণ্টের তোয়াক্কা করেন না। যত টাকা ঘাটতি পড়ে তিনিই পকেট থেকে দিয়ে দেন।

আমাকে ভুবনবাবু বলেছিলেন, এ এক অদ্ভুত পাড়া মশাই, কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না, আপনি নতুন এসেছেন, ক্রমে-ক্রমে সব দেখতে পাবেন—

কুমারী সুলতা হাজরা, কুমারী সুবর্ণা সেন, কুমারী অর্চনা সেনগুপ্তা···

—আপনার নাম ?

—শ্রীমতী ইন্দুলেখা দেবী।

মুখ তুলে চাইলাম। ক্যাণ্ডিডেটদের মধ্যে একমাত্র বিবাহিতা মেয়ে। বেশ বয়েস হয়েছে। মোটা-সোটা চেহারা। চশমা রয়েছে চোখে। ভারী গম্ভীর মুখ। মুখের দিকে চাইলে ভক্তিও হয়, ভয়ও হয়। দেখলেই মেয়েরা সমীহ করবে এমন চেহারা! ভুবনবাবুও ব'লে গিয়েছিলেন ম্যারেড-ক্যাণ্ডিডেট নিতে।

বললাম, আপনার ছেলে-মেয়ে ?···

ইন্দুলেখা দেবী বললেন, আমার ছেলেমেয়ে নেই।

—স্বামী কি করেন ?

—আমার স্বামী নেই।

চম্‌কে উঠলাম। চম্‌কে উঠে মহিলাটির মুখের দিকে আবার ভালো ক'রে তাকালাম। তবে কী ভুল দেখছি ? সিঁথিতে তো সিঁদুর রয়েছে ঠিকই। সিঁথিটা কপালের মধ্যখানে দু-ভাগে ভাগ করা—একটু যেন ঘোমটাও রয়েছে। বিয়ের সব লক্ষণই তো রয়েছে। আমি যেন নির্বোধের মত অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম মহিলাটির দিকে। কিন্তু সে খানিকক্ষণের জন্যে। তারপরেই সামলে নিলাম নিজেকে। ঊর্মিলা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নির্বাচনের ভারই শুধু আমার ওপর। আমি তো বিয়ের পাত্রী নির্বাচন করতে এখানে আসিনি। এর বেশি জানবার আগ্রহ হওয়াও আমার অন্যায়। এর বেশি জিজ্ঞেস করাও আমার পক্ষে অসঙ্গত।

আরো যেন কী-কী জিজ্ঞেস করার ছিল। সব যেন গোলমাল হয়ে গেল আমার। বেশ মুস্কিলে প'ড়ে গেলাম কিছুক্ষণের জন্যে। এই সামান্য ব্যাপারটার মধ্যেও যে এত সমস্যা থাকতে পারে, কে জানতো! গল্প লিখে, উপন্যাস লিখে বেশ তো অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করেছি। কল্পনায় অনেক জটিল জীবনের জট

ছাড়িয়েছি। কিন্তু এমন হবে তা-তো জানা ছিল না। দরজা বন্ধ ক'রে নিজের চেয়ার-টেবিলে বসে কলম চালিয়ে খ্যাতিও হয়েছে খুব। সবাই জানে, আমি লোক-চরিত্র বুঝি। বিশেষ ক'রে স্ত্রীলোকের চরিত্র। তাহ'লে সিঁদুর থাকলেও স্বামী না থাকার রহস্য কী? তবে কী এঁর স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে?
মহিলাটির মুখের দিকে মুখ না তুলেই বললাম, আপনি বসুন।
গল্প লেখার অনেক সুবিধে আছে। সেখানে কলম বন্ধ ক'রে ভাবা যায়, ভুল লাইনগুলো কাটাকুটি করা যায়। বেঠিক কথাগুলো নতুন ক'রে লেখা যায়। অনেক সময় পাওয়া যায় হাতে।
কিন্তু মহিলাটি নিজে থেকেই বলেন, আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করেছি।
স্বামীকে ত্যাগ করেছি! কেমন যেন উল্টো কথা। স্ত্রী কখনও স্বামীকে ত্যাগ করে নাকি? স্বামীই তো ত্যাগ করে স্ত্রীকে! কিন্তু ইন্দুলেখা দেবীর মুখের দিকে চেয়ে আমার যেন কেমন মনে হলো—আমি তাঁকে চিনি! কী যেন নাম, কী যেন পরিচয়—কোথায় যেন দেখেছি—বড় চেনা-চেনা মুখ—আর কিছু মনে পড়ে না। যেন অনেক দিন আগেকার দেখা মুখখানা। অনেকদিন আগেকার। তখন হয়তো ডায়েরী লিখতাম না।
জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কোনোদিন বাদামতলায় থাকতেন?
ইন্দুলেখা দেবী আমাব দিকে চেয়ে কী যেন বলতে গিয়ে দ্বিধা করতে লাগলেন।
বললাম, আমি বাদামতলাতেই ছিলাম, ছেলেবেলা আমার ওখানেই কেটেছে—ওটাই আমার জন্মস্থান।
ইন্দুলেখা দেবী বললেন, তা'হলে আপনি ওদের নিশ্চয়ই চেনেন? আমার স্বামীর নাম···
আর বলতে হলো না। এক নিমেষে যেন স্বর্গ-মর্ত্য পরিভ্রমণ ক'রে এলাম। অটলদা, অটলদার বাবা, অটলদার মা। অটলদার মায়ের সে কি কান্না! পাড়ার সমস্ত লোকজন তখন জড়ো হয়েছে, শাঁখ বাজছে, নহবৎ বাজছে, বেলফুলের মালা আস্তিনে জড়িয়ে বরযাত্রীরা আসর জাঁকিয়ে বসেছে। সিগ্রেট খাচ্ছে, সরবৎ খাচ্ছে—এমন সময় হঠাৎ সব গোলমাল থেমে গেল।

ভুবনবাবু ছুটি থেকে ফিরলেন একদিন।
বললেন, কী হলো মশাই? ঠিক করতে পারলেন কিছু?
বললাম, না, এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।
ভুবনবাবু বললেন, এতে আর ঠিক করাকরির কী আছে, যাকে হোক একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিন না। লোকের মুখ দেখে চরিত্র বুঝতে পারবেন বলেই তো আপনাকে কাজটা দিয়েছিলাম।
বললাম, আমায় মাফ করবেন ভুবনবাবু, আমি হেরে গেছি—আমার গর্ব চুরমার হয়ে গেছে!

—কেন ?
ভুবনবাবু যেন অবাক হয়ে গেলেন। আমার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে !
বললেন, কেন ? হেরে যাবার কী আছে ? গর্ব চুরমার হয়ে যাবার কী আছে ?
বললাম, আছে ভুবনবাবু, আছে। আপনারা মনে করেন, সাহিত্যিক হলেই তারা লোক চিনতে পারে, ভুল ধারণা আপনাদের। বানিয়ে-বানিয়ে আমরা গল্পই লিখতে পারি। সেটা চেষ্টা করলে আপনারাও লিখতে পারেন, আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না। একজনকে বেছেছিলাম, বি-এ পাস, ছেলে-মেয়ে নেই—কিন্তু স্বামীকে সে ত্যাগ করেছে। রাখবেন আপনারা তেমন টিচার ? বলুন ?
স্বামীকে ত্যাগ করেছে ?
ভুবনবাবু এত বছর স্কুল চালিয়ে আসছেন। বয়েসও হয়েছে তাঁর। অনেক দেখেছেন। অনেক দেশেও ঘুরেছেন। বহু লোক তাঁকে ঠকিয়েছে, তিনি শিখেছেনও প্রচুর। তাঁর মত লোকও দ্বিধা করলেন।
বললাম, আপনি বরং ভাবুন ক'দিন—কিংবা কমিটির মেম্বারদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।
জানতাম কমিটি-টমিটি কিছুই নয়, ভুবনবাবু নিজেই সব। তবু কমিটির নাম করলাম।
ভুবনবাবু বললেন, সে যা করবার আমিই করবো, আপনি তো আর ভালো ক'রে চেনেন না সকলকে।
বললাম, কিন্তু শেষকালে কোনও দোষ হ'লে যেন আমাকে দুষবেন না।
ভুবনবাবু বললেন, সে তো না-হয় দোষ দেবো না, কিন্তু স্বামীকে ত্যাগ করলো কেন ?
বললাম, নিশ্চয়ই স্বামীর কোনও দোষ ছিল বৈকি ?
—আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন নাকি ?
বললাম, তাই কী কখনও জিজ্ঞেস করা যায় !
কিন্তু ভুবনবাবু তো জানতেন না যে আমার সে-কথা জিজ্ঞেস করার দরকার হয়নি। আমি সবই জানতাম। তখন ডায়েরী লিখতাম না, তাই শুধু সঠিক সময় ও তারিখ জানা ছিল না। নইলে সবই তো মনে প'ড়ে গিয়েছিল।
মনে ছিল সেটা শীতকালের রাত। বোধহয় মাঘ মাসেই বিয়ে হচ্ছিল অটলদার। অটলবিহারী বসু। আমরা তখন কে-না চিনতাম। বাদামতলায় সব লোক চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতো—দেখ-দেখ, ছেলে তো নয়, হীরে !
সেই অটলদার বিয়ের দিনেই ঘটনাটা ঘটলো।
অটলদা ছিল আমাদের ক্লাবের মাথা। শুধু ক্লাবেরই মাথা কেন, পাড়ারও আইডিয়াল। ঠিক আমাদের সমগোত্রের মধ্যে পড়তো না অটলদা। হাতে সব সময় দেখতাম মোটা-মোটা ইংরেজী বই। ছোটবেলায় সে-সব বই-এর নাম দেখেও কিছুই বুঝতে পারতাম না। খেলার মাঠে একবার দেখা দিয়ে হঠাৎ কোথায় চলে যান। বাদামতলা তখন বেশ পেছনে প'ড়ে থাকার জায়গা। সেই অটলদাকে যদি কখনও জিজ্ঞেস করতাম—আজকে খেলবে না অটলদা ?

অটলদা বলতো—না রে, আজকে একটু ভবানীপুরে যেতে হবে।

হেড-মাস্টার ছিলেন সুরেশবাবু। ভারী কড়া লোক। খদ্দর পরতেন। খদ্দরের চাদর পরতেন গায়ে। দেখলে আমাদের ভয়-ভয় করতো। কিন্তু হঠাৎ যদি কখনও অটলদা এসে পড়তো স্কুলে, দেখতাম নির্ভয়ে ঢুকে পড়েছে হেড-মাস্টারের ঘরে। বাইরে থেকে শুনতে পেতাম অটলদার গলা। বড় গম্ভীর ভারী গলা ছিল অটলদার। অথচ ভারী মিষ্টি। হেড-মাস্টারও যেন স্নেহ ক'রে কথা বলতেন অটলদার সঙ্গে। কী কাজে যে আসতো অটলদা তা জানি না। আর শুধু কী স্কুলে হেডমাস্টারের কাছে? পাড়ায় দরিদ্র ভাণ্ডার ছিল। অটলদাই ছিল দরিদ্র ভাণ্ডারের পাণ্ডা। অটলদার চেষ্টাতেই দরিদ্র ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা। পাড়ায় বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে চাল ভিক্ষে ক'রে নিয়ে আসতাম আমরা। এনে জড়ো করতাম ভাণ্ডারের অফিসে। অটলদার ক্লান্তি ছিল না। আমাদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে রোদ্দুরে বৃষ্টিতে চাল ঘাড়ে ক'রে নিয়ে আসতো! চালই শুধু নয়, কাপড়, পয়সা সবই জড়ো হতো। সেই চাল বিলানো হতো বাদামতলার দুঃখী গরীব লোকদের মধ্যে। চুপি-চুপি তাদের বাড়ীতে গিয়ে দিয়ে আসতে হতো যাতে কেউ লজ্জায় না পড়ে।

সেবার আই-এ পরীক্ষার খবর বেরোলো।

বাদামতলার লোক শুনতে পেল—অটলদা বাদামতলা থেকে একমাত্র ছেলে যে স্কলারশিপ পেয়েছে।

আমরা সবাই অটলদার বাড়ীতে গেলাম। অটলদা স্কলারশিপ পেয়েছে, সে তো একরকম আমাদের পাওয়াই হলো। অটলদা তো বাদামতলারই গৌরব। অটলদা সমস্ত বাদামতলার ছেলেদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। বাদামতলার স্কুল থেকে সেই-ই প্রথম স্কলারশিপ্ পাওয়া। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে শুনলাম—অটলদা নেই।

অটলদার বাবা আশুবাবু বললেন, কাল রাত্তির থেকে সে বাড়ী আসেনি।

অটলদা বাড়ী আসেনি! আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। অটলদা সারারাত্রি কোথায় থাকে! অটলদা কী রাত্রেও বাড়ির বাইরে থাকে নাকি?

পরদিন ক্লাবে অটলদা এল। মুখ-চোখ ঢোকা। চুল উস্কোখুস্কো। যথারীতি ক্লাবে এসেই খেলার মাঠের জন্যে তৈরী হচ্ছিল। সবাই জড়ো হলাম অটলদার সামনে। অটলদা স্কলারশিপ পেয়েছে এ তো সামান্য কথা নয়! বাদামতলার ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। সেই অটলদাকে চোখের সামনে দেখছি এ আমাদের কতখানি সৌভাগ্য।

অটলদা নিজে থেকেই বললে, কী রে, কী দেখছিস অমন হাঁ ক'রে?

এতক্ষণ বলতে বাধা হচ্ছিল। কিন্তু আর সামলাতে পারলাম না।

বললাম, তুমি কাল বাড়ি ছিলে না অটলদা?

অটলদা বললে, হ্যাঁ, অনেক রাত হয়ে গেল কিনা, তাই বাড়ি ফিরতে পারলাম না।

—আমরা রাত্তিরবেলা আবার গিয়েছিলাম, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

অটলদা বললে, ভবানীপুরে।

তবু যেন আমাদের কৌতূহল মিটল না। কিন্তু সাহস ক'রে আর জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, ভবানীপুরের কোন্ পাড়ায়? কী এমন কাজ অটলদার সেখানে যে কাজ করতে করতে বেশী রাত হয়ে যায়, আর দেরী হয়ে গেলে বাড়ি আসা যায়

না? অটলদা এত বড় আদর্শের ছেলে যে তাকে নিয়ে কোনও সন্দেহজনক ব্যাপার কল্পনা করতে আমাদের আটকাতো। অটলদা আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারী। অটলদা বাদামতলা স্কুলের মুখোজ্জ্বলকারী ছাত্র—অটলদা বাদামতলার গৌরব। আমরা জানতাম যে সেই অটলদা কখনও কোনো অন্যায় করতে পারে না। আমার সঙ্গে অটলদার বয়েসের বেশি পার্থক্য ছিল না। হয়তো দু'-এক বছরের বড়ই মাত্র। কিন্তু অটলদার ব্যক্তিত্ব ছিল আকাশচুম্বী। অটলদার বয়েসটা ছিল গৌণ—অটলদার ব্যক্তিত্ব যেন সকলকে ছাপিয়ে অনেক উঁচুতে গিয়ে ঠেকতো।

কিছুদিন পরে টের পেলাম অটলদা ভবানীপুরে যায় কেন। কেন এক-একদিন রাত হয়ে যায় সেখান থেকে ফিরতে। সেখানে সেই ভবানীপুরেই অটলদা একটা ক্লাব করেছে। যত গরীব-দুঃখী তাদের পাড়া সেখানে। সেখানে তাদের জন্যে একটা নাইট-স্কুল করেছে অটলদা! তাদেরই বুঝি কার একজনের কলেরা হয়েছিল—দু'দিন দু'রাত সেই কলেরা রুগী ছেলেটারই সেবা করেছে। কিন্তু বাঁচাতে পারেনি! অটলদার দিকে সেদিনও চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলাম। কী ছেলে, নিঃশব্দে কতদিকে দেখছে অটলদা! নীরবে কত সেবা ক'রে যাচ্ছে। প্রশংসা চায় না, প্রচার চায় না। কথাটা আমাদের মুখে মুখে অনেকের কানে ছড়িয়ে পড়েছিল। সকলেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো চেয়ে চেয়ে।

অটলদা হঠাৎ সকলের মুগ্ধদৃষ্টির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল।

বললে, কী রে কী দেখছিস অমন ক'রে?

অটলদার বাবা আশুবাবুর তেমন পয়সা-কড়ি ছিল না। ছোট গলিতে সরু রাস্তার ধারে ভাঙা একটা বাড়ি। বাইরে ইঁটের দেওয়ালে বালি খ'সে-খ'সে পড়ছে। সেই জীর্ণ বাড়িখানা ছিল আমাদের কাছে তীর্থস্থান। সেই ঘরখানাতেই ছিল অটলদার আসন। সেখানেই একটা উঁচু তক্তপোষের ওপর একটা মাদুর পাতা থাকতো। আর চারপাশে বই! কেরোসিন কাঠের সস্তা শেল্‌ফে সাজানো বই সব। পরে সে-সব বড়-বড় লেখককের বই পড়েছি, তাঁদের নাম প্রথম শুনি অটলদার মুখে। নুট-হামসুন, ইব্‌সেন, বার্ণাড' শ', আলডাস হাক্সলির নাম অটলদার মুখেই প্রথম শুনি। বইগুলো নাড়াচাড়া ক'রে দেখেছি—সে-সব বড়-বড় কথা, তখন দু-এক লাইন প'ড়ে তার কিছুই মানে বুঝতে পারিনি। অটলদা সব বুঝতে পারতো। মনে হতো, আমাদের বাদামতলা স্কুলের হেড্‌-মাস্টার সুরেশবাবুও যা না বুঝতে পারতেন, তাও বুঝি বুঝতে পারতো অটলদা। দেয়ালে কত রকমের চার্ট! কড়ি-কাঠ থেকে ঝুলতো রিং। এই রিং ধ'রে শরীরচর্চা করতো অটলদা। ভোরবেলা উঠে মুখ-হাত-পা ধুয়ে ব্যায়াম করতে শুরু করতো! তারপর খানিকক্ষণ ধ্যান করতো।

অটলদা আমাদেরও ধ্যান করতে বলতো।

আমরা বলতাম—ধ্যান যে করবো, মন্তর জানি না যে!

অটলদা হাসতো।

বলতো—ধ্যান করতে মন্তর দরকার হয়, কে বললে?

বলতাম—তা'হলে কী ব'লে ধ্যান করবো?

অটলদা বলতো—দেয়ালে একটা দাগ দিবি, পেন্সিলের গোল দাগ—সেইদিকে

একদৃষ্টে চেয়ে থাকবি, চোখের পলক ফেলবি না—এই দ্যাখ্ এমনি ক'রে—

ব'লে অটলদা তক্তপোষের ওপরে পাতা মাদুরের ওপর পদ্মাসন ক'রে বসতো। তারপরে দেয়ালে একটা পিচ-বোর্ডে লাল বিন্দু আঁকা ছিল, সেইদিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ।

তারপর বললে, প্রথম-প্রথম এমনি পাঁচ-সেকেণ্ড, দশ সেকেণ্ড ধ'রে চেয়ে থাকবি। তারপর এক-মিনিট, দু-মিনিট ক'রে বাড়াবি—অভ্যাস হয়ে গেল তখন আর কষ্ট হবে না।

বললাম, তুমি কতক্ষণ চেয়ে থাকো অটলদা ?

অটলদা বললে, আমি কি তেমন কবতে পারি, এখনও আমাকে অনেকদিন ধ'রে প্র্যাক্টিশ করতে হবে। ভারী শক্ত জিনিস।

বললাম, এ করলে কী হবে ?

অটলদা বললে, এতে মনের একাগ্রতার ক্ষমতা বাড়বে, উইল-পাওয়ার বাড়বে। শেষে এমন হবে, চার-পাঁচদিন না খেয়ে থাকতে পাববি, সমুদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে থাকতে পারবি।

—তুমি পারো অটলদা ?

অটলদা হাসতো।

বলতো—দূর, অত সোজা নাকি ? এ কি একদিনে হয় ? কত বছর ধ'রে সাধনা করলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়। একবার সিদ্ধি হ'লে দেখবি—একখানা মোটা বই একবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যাবে। তখন দেখবি—চোখ দিয়ে জ্যোতি বেরোচ্ছে তোর, তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারবে না—তুই যাকে-তাকে দিয়ে যা খুশী করাতে পারবি। এই করেই আমি ফার্স্ট হই একজামিনে। আমি তো পড়ি না বেশি, অন্য ছেলেরা পঞ্চাশবার পড়লে যা হয়, আমি একবার পড়লেই সেই কাজ হয়ে যায়।

বললাম, আমিও তোমার মত করবো অটলদা।

অটলদা বললে, কিন্তু তা করতে হলে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। ব্রহ্মচর্য পালন না করলে কিছু হবে না, বরং উল্টো ফল।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, উল্টো ফল হবে ?

—হ্যাঁ, ব্রহ্মচর্য পালন না ক'রে ধ্যান-ট্যান করলেই হার্টফেল করবি।

অটলদার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম।

অটলদা আবার বলতে লাগলো—একেবারে মারা যাবি। কত লোক এ করতে গিয়ে মারা গেছে একেবারে, কিম্বা প্যারালিসিস হয়ে চিরজীবনের মত ইন্‌ভ্যালিড্ হয়ে গেছে।

বললাম, ব্রহ্মচর্য কী-রকম ক'রে করতে হবে ?

অটলদা বলতো, মেয়েমানুষের দিকে একেবারে মুখ তুলে চাইবি না। সমস্ত মেয়ে-জাতটাকে মায়ের জাত মনে করবি—তোকে একটা বই দেবো পড়তে। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা। স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়েই তো আমি সব শিখেছি রে। অদ্ভুত লোক ওই একটা। একখানা বই একবার চোখ বুলোলেই সব মুখস্থ হয়ে যেত তাঁর, জানিস—তিনি কোনো থিয়েটারের বাড়ির ফুটপাত দিয়ে পর্যন্ত হাঁটতেন না।

বললাম, কেন ?
—ওই যে থিয়েটারের মধ্যে যত খারাপ মেয়েমানুষের আড্ডা।
অটলদার ঘরে ব'সে থাকতে থাকতে অনেকদিন নিজেকে যেন কেমন ছোট মনে হয়েছে। কেবল মনে হয়েছে কেমন ক'রে অটলদার মত লেখাপড়ায়, স্বভাবে-চরিত্রে আদর্শ হবো। সে সব একদিন গেছে আমাদের। আমাদের ক্লাবের সব ছেলেদের এইরকম আশা ছিল। সবাই অটলদা হবো। আমরা সবাই অটলদার মত ক'রে চুল ছাঁটতাম, অটলদার মতন ক'রে ধুতি-শার্ট পরতাম। নিজের পড়বার ঘরটাকে অটলদার ঘরের মতন করে সাজাতাম। সেই নুট-হামসুনের বই, আলডাস-হাক্সলির বই, ইবসেনের বই, বার্নাড শ'র বই কিনে সাজাতাম! স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-লেকচারের বই পড়তাম, ব্রহ্মচর্য পড়তাম! তখন বুঝেছিলাম ব্রহ্মচর্য কী কঠোর সাধনার জিনিস।
অটলদা বলতো, মনে খারাপ চিন্তা এলেই তোর মায়ের কথা ভাববি।
আরো বলতো, শরীরটা ঠিক রাখবি, দেখবি শরীরটা যদি ঠিক থাকে তো, মনটা কখনো বেঠিক থাকতে পারে না।
এক-একদিন ভোরবেলা রাত থেকে উঠে বেড়াতে যাবার আগে অটলদাকে ডাকতে গেছি। ভেবেছি অটলদা হয়তো তখনও ঘুমোচ্ছে। শীতকাল। আলোয়ান মুড়ি দিয়ে নাক-কান ঢেকে বেরিয়েছি। কিন্তু অটলদার বাড়ীর সামনে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখি, অটলদা ততক্ষণে তৈরী হয়ে নিয়েছে। সেই শীতে দাড়ি কামানো, স্নান করা সব শেষ ক'রে ফেলেছে। বোধহয় ধ্যান-জপ-তপ সব শেষ হয়ে গেছে। হ্যারিকেন জেলে একটা বই নিয়ে পড়তে বসেছে একমনে। মনে আছে, আমরা কোনোদিন অটলদাকে ভোরবেলা ওঠা নিয়েও হারাতে পারিনি।

সেই অটলদাই পরে আরো বড় হলো। কলেজের একজামিনে প্রথম হলো। আমরা তখন অটলদার দেখা পেতাম কম। বাদামতলা ছাড়িয়ে অটলদার কাজের ক্ষেত্র আরো অনেকদূর ছড়িয়ে পড়লো। কখন কলেজে যায়, কখন আসে টেরই পাই না। কলেজের ছুটির পর বাড়ি ফিরে আমাদের ক্লাবে রোজ আসতেও পারে না। বাড়িতেও আসতে পারে না সময়মত।
জিজ্ঞেস করি, কোথায় ছিলে কাল অটলদা ?
অটলদা বলে, একটা মিটিং ছিল।
রোজই একটা-না একটা মিটিং থাকে অটলদার। রোজই প্রায় কাজ থাকে। কত কাজের মানুষ অটলদা। তার তো শুধু আমাদের ক্লাব নিয়ে প'ড়ে থাকলে চলবে না।
অটলদা বলতো, আমি আসতে পারি না ব'লে তোদের কাজ যেন বন্ধ না হয়। কাজ ঠিকমত চালিয়ে যা তোরা।

কাজ আমাদের ঠিকই চলতো। আমাদের কাজ মানেই তো অটলদার কাজ।
অটলদা কখনও হঠাৎ এসে হাজির হতো। আবার কয়েকদিন তার দেখা পাওয়া যেত না। সকালবেলাও তার বাড়িতে যাওয়া বন্ধ ছিল কয়েকদিন। অটলদা বলে দিয়েছিল—সময় নেই তার। অনেক কাজ তখন তার হাতে।
তখন বাদামতলা ছাড়িয়ে অটলদা আরো দূরের মানুষ হয়ে গেছে। কলেজের নতুন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে অটলদা নতুন কাজ সুরু ক'রে দিয়েছে। আমাদেরও তখন ম্যাট্রিক দেবার সময়। আমরাও নতুন মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছি।
এক-একদিন হঠাৎ দেখা হ'লে অটলদা কাছে এগিয়ে আসে।
বলে, কী-রকম পড়াশুনা চলছে তোদের ?
বলতাম, ভয় করছে অটলদা।
—ভয় ? ভয় কীসের ?
বলতাম, তোমার মতন তো ব্রেন নেই আমাদের।
অটলদা বলতো, ব্রেন কী কারো ভগবান দেয় ? ব্রেন তৈরি করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের কি আমাদের থেকে আলাদা ব্রেন ছিল ? সাধনা করতে হয়, মন দিতে হয়—তবে হয়। কঠোর ব্রহ্মচর্য চাই—তা'হলে কেউ আটকাতে পারবে না—একবার যা পড়বি, সব মনে গাঁথা হয়ে যাবে—সেই নিয়মটা পালন করিস ?
—কোন্ নিয়ম ?
—সেই যে বলেছিলুম ধ্যান করতে ?
বললাম, চেষ্টা করি, রোজ হয়ে উঠে না, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে যায়।
—কেন ?
বললাম, ওদিকে রাত জেগে পড়ি কিনা, তাই ভোরবেলা ঘুম ভাঙে না।
অটলদা বললে, ক'ঘণ্টা ঘুমোস ?
অটলদার সামনে যেতেও শেষকালে যেন লজ্জা হতো। নিজেদের শক্তি নিজেদের সামর্থ্যের সীমা দেখেও যেন নিজেরা লজ্জা পেতাম। অটলদা তো প্রতিভা! আমরা তো সবাই অটলদার কাছে নগণ্য। আমরা কেমন ক'রে মুখ দেখাবো অটলদার কাছে। একটা থিয়োরেম কষতে আমরা হিমসিম খেয়ে যাই। দশবার একটা পাতা পড়েও মুখস্থ হয় না। আমদের কতটুকু ক্ষমতা। রাস্তায় কোনও সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখলে একটুতেই চঞ্চল হয়ে উঠি। আমাদের কতটুকু সংযম—কতটুকু ব্রহ্মচর্য! নিজেদের ধিক্কার দিই আমরা। আমরা কী অটলদার মত সুন্দরী মেয়েদের দেখে মা'র কথা ভাবতে পারি ? আমরা কত দুর্বল! আমাদের চরিত্র কত ভঙ্গুর! এক-একদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ দেখি, অটলদা হাতে মোটা-মোটা বই নিয়ে হন্ হন ক'রে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে।
বললে—কীরে, এত রাত্তিরে কোথায় ?
বললাম—ডাক্তারখানায় গিয়েছিলাম ওষুধ আনতে—বাবার অসুখ। কিন্তু তোমার যে এত রাত হলো ?
অটলদা বললে—আমার তো এমনি রাতই হয় আজকাল।

বললাম—তা ব'লে এত রাত ? এখন যে রাত ন'টা বেজে গেছে।
অটলদা বললে—এক-একদিন এর চেয়েও রাত হয়।
বললাম—কেন ? কেন রাত হয় অটলদা ?
অটলদা বললে—আজকাল ভবানীপুর থেকে আবার এলগিন রোডে যাই কিনা—ওখানেও ছেলেরা ছাড়ে না। তারপর লাইব্রেরীতে যেতে হয়—এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে আজকাল বড্ড সময় দিতে হচ্ছে।
তারপর একটু থেমে বললে, এই দ্যাখ্ না, এই তিনখানা বই নিয়ে যাচ্ছি, এগুলো আজ রাত্রেই শেষ ক'রে আবার কাল সকালেই ফেরত দিয়ে আসতে হবে।
আমি আরো অবাক হয়ে গেলাম। অত মোটা-মোটা তিনখানা বই পড়বে, কখনই বা ঘুমোবে। অটলদার ক্ষমতাও অদ্ভুত, স্মরণশক্তিও অপূর্ব! বাদামতলার লোকেরা জানতো, আশুবাবুর ছেলে অটল ক্রমে ক্রমে বাদামতলার গৌরব আরো বাড়িয়ে দেবে একদিন। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছে, ইণ্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পেয়েছে। যতদিন কলেজে পড়বে ততদিনই পাবে। ও-ছেলে কখনও বদনাম করবে না বাদাম-তলার।
এমনি ক'রে একদিন বি-এও পাস করলো অটলদা।

আজ অনেকদিন আগেকার কথাগুলো ভাবতে গিয়ে কেমন যেন হাসি পাচ্ছে। সেদিন তো আমরা তাই-ই জানতাম, তাই-ই বিশ্বাস করতাম। ছোটবেলার পড়ার বইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই থেকে শুরু ক'রে মহা-মনীষীরা যা-যা সব কথা লিখে গেছেন, তাই-ই বেদবাক্য ব'লে বিশ্বাস করতাম। তখন কী জানতাম, লেখাপড়াতে ফার্স্ট হওয়াও যেমন, তবলা-বাজানোতে ফাস্ট হওয়াও তেমনি এক জিনিস! তখন কেবল বিশ্বাস করতাম, জীবনে উন্নতি করতে চাইলে, জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চাইলে লেখাপড়ায় প্রথম হতেই হবে! জীবনে কখনো স্কলারশিপ পাইনি পাঠ্যজীবনে, সাধারণভাবে পাস করতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে আমাদের। তাই জানতাম আমাদের কিছুই হবে না। সমস্ত জয়মাল্যগুলো একমাত্র অটলদারই প্রাপ্য। শুধু আমি নয়, বাদামতলার সমস্ত লোকই সেই কথা ভাবতো। তাই সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে সবাই শুধু চেয়ে থাকতো অটলদার দিকে। কী চমৎকার ছেলে, কোনও বিলাস নেই, কোনও অহঙ্কার নেই। নিতান্ত সাদাসিধে নিরহঙ্কার মানুষ, অথচ জ্ঞানে, বিদ্যায়, প্রতিষ্ঠায় কত উঁচু। আর ক'টা বছর যাক্, তখন একেবারে সকলের শীর্ষমণি হয়ে বসবে। আশুবাবুর মুখ উজ্জ্বল করবে, বাদামতলার মুখ উজ্জ্বল করবে, সমস্ত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মুখ উজ্জ্বল করবে। লেখাপড়াই যখন সংসারে জ্ঞানের এবং প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাপকাঠি তখন অটলদাকে আর কে রাখে!
পাড়ার হিতৈষী-বন্ধুরা কেউ কেউ বললেন, এবার আপনার ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে দিন আশুবাবু, ব্যারিস্টারী প'ড়ে আসুক।

কেউ বললেন, কেন, রুড়কীতে পাঠিয়ে দিন, ইঞ্জিনিয়ারিংই বা মন্দ কী ?
আবার কেউ বললেন, পয়সা আছে ডাক্তারীতে—তেমন ডাক্তার ক'টা আছে দেশে !
আশুবাবু বললেন, আমি কী বলবো। আমাকে তো ছেলের পড়ার জন্যে কখনো একটা পয়সাও খরচ করতে হয়নি, ও ওর স্কলারশিপের টাকাতেই পড়ার খরচ চালিয়েছে—তার নিজের যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই যাক্।
—তা ছেলের কোন্‌দিকে ঝোঁক ?
আশুবাবু বলতেন, ও তো বলে প্রফেসারী করবে।
—কিন্তু প্রফেসারীতে কি পয়সা আছে ?
তা আমরা যখন আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ছি, এ সেই সময়ের কথা।
হঠাৎ একদিন শুনলাম, অটলদার বিয়ে। অটলদা তখন এম-এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট-ক্লাস-ফার্ষ্ট হয়ে বিলেত যাবার ব্যবস্থা করছে।
হঠাৎ খবরটা রটে যেতেই চারিদিকে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। শোনা গেল, বিয়ে হচ্ছে বিখ্যাত এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে। আলিপুরের বিরাট ধনী। আমরা দূর থেকেই বাড়িটা দেখেছি। ভেতরে কখনও যাইনি। দেখেছি দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে বন্দুক নিয়ে। শুনলাম বড়-বাজারে লোহার কারবার। সংসার সামান্য। কর্তা আর গিন্নী—আর কেবল একটিমাত্র মেয়ে। অর্থাৎ অটলদা গরীব হলেও কেবল ভাল পাত্র বলেই বিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা। ছেলের বিলেত যাওয়ার যাবতীয় খরচ সবই তাঁরা দেবেন। শুধু তাই নয়, তারপর তাঁদের অবর্তমানে অটলদাই সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

সেই বিয়ে !
মানুষের জীবনে ভাগ্য কখন কেমন ক'রে কী ভাবে উদয় হয় কে বলতে পারে !
অটলদাই কী জানতো ! না অটলদার স্ত্রীই জানতো, না জানতো বাদামতলার লোকেরা, না জানতে পেরেছিলাম আমরা ?
সেই বিয়ে ! সেই বিয়ের দিনই ঘটনাটা ঘটলো।
ইন্দুলেখা দেবীর দরখাস্ত, তার চেহারা, তার সিঁথির সিঁদুর, তার ঘোমটা, সবটুকু কেমন যেন আমাকে অবাক ক'রে দিয়েছিল। শেষকালে তার চাকরির দরখাস্তের বিচারের ভার এত লোক থাকতে আমার কাছে এসে পড়বে, এইটেই তো আশ্চর্য ! আমি করবো অটলদার বিচার ! আমি হবো অটলদার ভাগ্যনিয়ন্তা ! এও এক পরিহাস বৈকি ! আজ অটলদাকে সামনে পেলে যেন একবার বোঝাপড়া ক'রে নিতাম। এ পরিহাসের অর্থ কি ! কেন এমন হয়। নইলে অটলদার কীসের অভাব ছিল ? প্রতিভা, না প্রতিষ্ঠা, না বিদ্যা, না জ্ঞান—কীসের ? মনে আছে, শেষ যখন অটলদাকে দেখেছি তখন আমি চোখের জল রাখতে পারিনি। অটলদার সে চেহারা তখন কী যে হয়েছে ! বুকের পাঁজরগুলো যেন গোণা যায়।
ঘাটশিলার একটা টিনের চালের বাড়ির রোয়াকে এক বাটি মুড়ি খাচ্ছিল অটলদা !

অটলদা বলেছিল, তুই বড় হয়েছিস্, তোর নাম হয়েছে, তাতে আমি খুশি হয়েছি ভাই !
বলেছিলাম, কিন্তু এ তোমার কী হলো অটলদা ?
অটলদা বলেছিল, কেন, কী হয়েছে রে আমার ?
বলেছিলাম, তোমার শরীর যে একেবারে ভেঙে গেছে ?
অটলদা বলেছিল, তাতে কী হয়েছে, মন তো আমার ভাঙেনি, মনটাই তো সব ।
বলেছিলাম, তোমার ওপর আমাদের কত আশা ছিল জানো, তুমি কত বড় হবে, কত গর্ব তুমি আমাদের সকলের !
অটলদা মুড়ি খেতে খেতে যেন থামলো একবার ।
বললে, ওগো শুনছো, কোথায় গেলে তুমি ?
আশে-পাশে চেয়ে দেখলাম, ঘরের ভেতর থেকে অটলদার স্ত্রী বেরিয়ে এলো ।
অটলদা বললে, ওঁকে প্রণাম কর, তোর বৌদি ।
মনটা একটু বিষিয়ে উঠেছিল প্রথমে ! প্রণাম করতে হবে ! সোজা চোখের ওপর চোখ তুললাম । কালো-রোগা চেহারা ! একটা চশমাও পরেছে । সোনার চুড়ি দু'গাছা হাতে । মনে হলো যেন রাঁধতে রাঁধতে চলে এসেছে ! মিলের একটা মোটা শাড়ি পরনে ।
হাত তুলেই প্রণাম করলাম ।
অটলদা বললে, ওর নাম বললে তুমি চিনতে পারবে, আমাদের বাদামতলার ছেলে, এখানে সাহিত্য-সভায় সভাপতি হয়ে এসেছে—মুড়ি খাবি তুই ?
ঠিক দারিদ্র্যের জন্যে নয়, ঠিক ময়লা শাড়ি কিংবা টিনের চালের বাড়ির জন্যেও নয় । আর ঠিক কী কারণে যে তা-ও এখন এতদিন পরে বলতে পারবো না । কিন্তু আমার মনে হলো, এ-অবস্থায় এখানে না এলেই যেন ভাল হতো !
অটলদাকে ঠিক এ-অবস্থায় দেখতে চায়নি যেন মন । সেই অটলদা যাকে আমাদের সমস্ত ছেলেদের আদর্শ ব'লে মনে হতো, সেই অটলদাই কিনা ঘাটশিলায় এই মাষ্টারি নিয়ে এই অবস্থায় প'ড়ে আছে । অথচ অটলদা কী না হতে পারতো ! কত আশা করেছিল সবাই । অথচ শ্বশুরের কত টাকা, কত টাকার মালিক হতে পারতো অটলদা । সমস্ত লোহার কারবারটার একমাত্র মালিক হতো তো অটলদাই । আর কেউ নয় । কেন সব হারাতে গেল অটলদা ! শুধু কী ভাগ্য ? আর কিছু নয় ?
অথচ বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত কেউ কিছু জানতে পারেনি ।
আমরা ও জানতে পারিনি ।
তাই বলছিলাম, অটলদার বিয়ের দিনেই ঘটনাটা ঘটলো ।

সে-সময় তো ডায়েরি লিখতাম না । তাই সঠিক তারিখটা মনে নেই । শুধু মনে আছে, আমরা সবাই নেমতন্ন খেতে গেছি, বাদামতলার কেউ-ই আর নিমন্ত্রিত হতে

বাকি থাকেনি। বড়লোকের বাড়ি। রসনচৌকি, নহবৎ, ব্যাণ্ড, ফুলের মালা। সমস্ত সামনের রাস্তাটা মোটরে-মোটরে ছেয়ে গেছে। আমরা বরযাত্রী। আমরা বাসে ক'রে গিয়ে হাজির। বাদামতলা থেকে আলিপুর—বেশি দূর নয়। অটলদাও মোটরে গিয়ে হাজির। সঙ্গে আশুবাবু, নাপিত, পুরুত, সবই আছে। সমস্ত মোটরটা ফুলে-ফুলে ঢাকা। অটলদাকে দেখে কেমন যেন বিব্রত মনে হচ্ছিল।
আশুবাবু বললেন, অটল কিছুতেই রাজী হতে চায় না। বললে, এত জাঁকজমক না করলেও চলতো।
অটলদা বিয়ের আগের দিনও কিছু জানতো না। গিয়েছিল রাঁচীতে। সেখানে গিয়েও আমদের চিঠি লিখেছিল। বাংলাদেশের মানুষের চরিত্রের কথাই লিখেছিল সে-চিঠিতে। কোথায় আমাদের চরিত্রের দোষ। মেরুদণ্ড নাকি আমাদের বেঁকে গেছে। একে সংশোধন করতে হবে। এ না করলে জাতি হিসেবে আমাদের পেছিয়ে পড়তে হবে। অন্য দেশের লোকেরা হু-হু ক'রে এগিয়ে চলেছে। তোরা মানুষ হ'। কথায় আর কাজে এক হতে হবে—বাঙালী চরিত্রে এই-ই দোষ। আমি বাইরে এসে দেখছি, এরা আমাদের মত নিষ্ঠাবান না হোক্, উদ্যমী। এদের মধ্যে একতা আছে—আমাদের মধ্যে যেটার সবচেয়ে বড় অভাব! আমি ফিরে আবার আমাদের ক্লাবে গিয়ে নতুন ক'রে তোদের বলবো সব। আমাদের নতুন ক'রে ভাবতে হবে। শিক্ষাই যদি সার্থক না হয়, তাহ'লে জীবনে তো সবই পণ্ডশ্রম।
আরো অনেক কথা রাঁচী থেকে লিখেছিল অটলদা।
এমন ক'রে কাজে আর কথায় কে এক হতে পেরেছে অটলদার মত! তখনই শুনলাম অটলদার বিয়ে। যেদিন ফিরে এলো অটলদা—সেদিন আমরাও অপেক্ষা করছিলাম বাড়ির সামনে।
জিজ্ঞেস করলাম—কাল তো তোমার বিয়ে অটলদা—
—বিয়ে!
কথাটা শুনে অটলদা চমকে উঠলো যেন।
তারপর বাড়ির মধ্যে চলে গেল। বাড়ির ভেতরে কী ঘটেছিল জানি না। আমরা বিয়ের দিন যথারীতি সেজে-গুজে নেমতন্ন খেতে গেছি বরযাত্রী হয়ে। এক-একগ্লাস সরবৎ দিয়ে গেছে সবাইকে। মাথায় পাগড়ি-পরা-খানসামা-বয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারো হাতে ট্রে, ট্রেতে পান, সিগ্রেট, দেশলাই, কিম্বা আইসক্রিম। সমস্ত বাদামতলার লোকই বরযাত্রী হয়ে এসেছে। আশুবাবুর প্রথম ছেলের বিয়ে--কাউকে বাদ দেননি। পাত্রীপক্ষ বড়লোক। তাদের কিছু গায়ে লাগে না।
অটলদাকে একটা কিংখাব-মোড়া সিংহাসনের ওপর বসানো হয়েছিল। কী চমৎকার দেখাচ্ছিল অটলদাকে। সমস্ত লোক অটলদাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে। নাক-চোখ-মুখের অমন গড়ন। এমন পুরুষমানুষের চেহারা! ফর্সা টক্-টক্ রঙ! গরদের পাঞ্জাবী প'রে সভা আলো ক'রে বসে ছিল অটলদা।
একসময় বরকর্তা এসে অটলদাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ভেতরে বরণ হবে—তারপর সম্প্রদান! শাঁখ বেজে উঠলো। বাইরে থেকে শাঁখের আওয়াজ কানে এলো। তারপর খাওয়ার ডাক এলো আমাদের।
সামনের বাগানে চেয়ার-টেবিল পেতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। লুচি দিচ্ছে,

মাংস দিচ্ছে, চপ-কাটলেট—কোনো কিছুই বাদ নেই। বড়লোকের বাড়ি—অটলদার শ্বশুরবাড়ি। অধিকার আছে আমাদের এখানে। আমাদের যেমন অধিকার আছে অটলদার ওপর, তেমনি অধিকার আছে অটলদার শ্বশুরবাড়ির ওপরও। বড় বড় গরম-গরম কাটলেট দিচ্ছিল। এক-এক কামড়ে উড়িয়ে দিচ্ছি আমরা। অটলদা একদিন এই বাড়িরই মালিক হবে। এই সমস্ত সম্পত্তির। পাড়ার অনেক লোক হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখছিল। হবে না কেন? এমন পুত্রভাগ্য ক'জন বাপের হয়! এরপর অটলদা আরো কত বড় হবে, আরো কত ঐশ্বর্যবান হবে। সে তো আমাদের পক্ষে আনন্দেরই খবর, আমাদের পক্ষে সুখেরই কথা। আমাদের অটলদা বড় হওয়া মানে তো আমাদের ক্লাবই বড় হওয়া! আমাদের ক্লাবের নিজস্ব বাড়ি হবে, অটলদা বলেছিল আরো মেম্বার বাড়াবে। বাদামতলা ছাড়িয়ে ভবানীপুর, কালিঘাট, এলগিন রোডের ছেলেরা পর্যন্ত এই ক্লাবে আসবে। খেতে ব'সে এইসব কথাই ভাবছি, হঠাৎ···

হঠাৎ গোলমালের শব্দ কানে এলো। ভেতরে বাড়িতে যেন হৈ-চৈ হচ্ছে খুব। কে যেন কাকে চিৎকার ক'রে ডাকলে।

ওদিকে বিয়ের শাঁখ বাজছে। সম্প্রদানও শেষ হয়ে এলো, এমন সময় কিসের যেন গোলমালে হঠাৎ সব থেমে গেল। যারা পরিবেশন করছিল—তারা দই আনতে গিয়ে আর যেন ফিরলো না।

কমলদা খেতে-খেতে বললে, কই হে, মিষ্টিওয়ালা কোথায় গেল?

বিশুদা বললে, ভেতরে কিসের গোলমাল শুনছি যেন?

কিন্তু বিয়ে-বাড়িতে অমন গোলমাল তো হবেই। গোলমাল না হ'লে তো বিয়ে-বাড়ি মানায় না! অসংখ্য লোকজন, আত্মীয়-বান্ধব জমা হয়েছে, বরযাত্রীরা এসেছে, গোলমাল তো হবেই। অনেকক্ষণ ব'সে-ব'সেও কেউ যেন আর পরিবেশন করতে আসছে না।

অটলদার বাবা আশুবাবুকে দূর থেকে দেখতে পেলাম। তিনিও যেন উত্তেজিত। যেন ওদিক থেকে সেদিকে চলে গেলেন। কিছু-কিছু লোক তাঁর পেছনে-পেছনে ও-ধারে চলে গেল। যারা আমাদের সঙ্গে খেতে বসেছিল, তারাও কয়েকজন টেবিল ছেড়ে উঠে গেল ওদিকে।

আমরাও উঠবো-উঠবো করছি—

বিশুদা বললে, চলো হে দেখে আসি, ব্যাপারটা সামন্য নয় বলে মনে হচ্ছে।

হুড়মুড় ক'রে সবাই দৌড়লাম।

বিরাট মার্বেল পাথরের বাড়ি। বাগান থেকে উঠে সামনের ফুল-বারান্দা। বারান্দার মধ্যে দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি উঠেছে। সমস্ত বাড়িটা ফুলে-ফুলে ফুলময়। কিংখাবে ব্রোকেডে মোড়া। ঝালর-ঝোলানো পর্দার বাহার। সিঁড়ি দিয়ে আমরাও উঠলাম। আমাদের সামনেও অনেক লোক চলেছে। সবাই বরযাত্রী, সবাই-উত্তেজিত।

বিশুদা বললে, নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড বেধেছে!

সামনের দিকে আরো ভিড়! ভিড় ঠেলে আমরা এগিয়ে গেলাম। পাশাপাশি পর্দা-ঝোলানো অনেক দরজা। বিরাট হলের সবগুলো দরজার সামনে ভিড়। ভেতর

থেকে হোমের গন্ধ আসছে। যেন অটলদার গলার শব্দও পেলাম বলে মনে হলো। তারপর মনে হলো যেন আর-একজন মেয়েমানুষের গলাও শুনতে পেলাম। কৌতূহল আরো বাড়লো। ভিড় ঠেলে একেবারে ভেতরে যাবার চেষ্টা করলাম।
বিশুদা বললে, আমার পেছন-পেছন ঢুকে আয় তোরা।
কমলদা আমার পেছন-পেছন আসতে লাগলো।
কিন্তু ভেতরে উঁকি মেরেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম!
বোধহয় তখনো সম্প্রদান শেষ হয়নি।
হোমের আগুনের সামনে লাল বেনারসী প'রে নতুন বউ অটলদার হাতে-হাত রেখেছে। কন্যাকর্তা গবদেব জোড় প'রে এতক্ষণে কন্যা সম্প্রদান করতে বসে-ছিলেন। আশুবাবুও সামনে ছিলেন। আর সকলের সামনে দেখালাম আর এক ট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারও মাথায় ঘোমটা। সর্বাঙ্গ একটা সুতির শান্তিপুরের শাড়িতে জড়িয়ে নিয়েছে শরীরটা। তার পেছনটা দেখতে পাচ্ছি শুধু।
একটু পাশে যেতেই মুখখানা দেখতে পেলাম!
শুধু মুখখানা নয়! সর্বাঙ্গ!
হাতে একগাছা শুধু চুড়ি। কানে পাতলা একজোড়া দুল। ছিপ্-ছিপে চেহারার কালো একটি মেয়ে। চোখদু'টো যেন তার জ্বলছে।
জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটা কে বিশুদা?
বিশুদা বললে, চুপ কর্ না—শুনি—
মেয়েটি বলছে, ইনি আমার স্বামী।
আশুবাবু বলছেন, কে তোমার স্বামী? অটল?
—হ্যাঁ, আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছে।
বিয়ে! আশুবাবু যেন ক্ষেপে উঠলেন। আশুবাবু নিরীহ মানুষ। ক্ষেপেন না তিনি সহজে। রাগতে তাঁকে আমরা বাদামতলার লোকেরা কখনও দেখিনি।
মেয়েটি বললে, বিশ্বাস না হয়, ওকেই জিজ্ঞেস করুন।
আশুবাবু বললেন, ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? আমার ছেলে, আমি জানি না? আমি কবে ওর বিয়ে দিলুম যে, তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হতে গেল?
মেয়েটি বললে, বিয়ে আপনি দেবেন কেন? বিয়ে আমরা নিজেরা করেছি।
—বিয়ে তোমরা করেছো?
—হ্যাঁ, যদি বিশ্বাস না হয় তো আপনার ছেলেকেই জিজ্ঞেস করুন না—
কন্যাকর্তা উঠে দাঁড়ালেন।
বললেন, তুমি কাদের মেয়ে? তুমি এখানে কী করতে এসেছো?
মেয়েটি বললে, আপনারা আমাকে খবর দেননি, আমি খবর পেয়ে নিজেই এসেছি।
—কিন্তু এ-সময়-কেন এলে? এখন যে বিয়ে হয়ে গেছে আমার মেয়ের সঙ্গে! আগে জানালেই হতো।
—আগে কি জানতাম, আপনারা আমাকে জানালেন না কেন?
কন্যাকর্তা হেসে উঠলেন। বললেন, শোনে কথা, আগে যদি জানতেই পারবো তো তোমাকে জানাতাম না মনে করছো? ·
আশুবাবু বললেন, তুমি মা এখন এসো এখান থেকে, যা বলবার কাল অটলকে এসে

বোলো—অটল তো কাল বউ নিয়ে বাড়ি যাবে, সেখানেই বোঝাপড়া হবে।
মেয়েটি বললে, আমি আজই জানতে চাই, আমি কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না!
কন্যাকর্তা বোধহয় ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিলেন আর একটু হ'লে।
বললেন, তুমি যদি কথা না শোন তো আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।
মেয়েটিও যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে।
বললে, যা ব্যবস্থা করবার ইচ্ছে তাই করুন—আমিও তাই চাই।
কন্যাকর্তা বললেন বেয়াইমশাই, তাহ'লে ব্যবস্থা করি, আপনি কী বলেন?
আশুবাবু বুঝিয়ে বললেন, মা, কেন গণ্ডগোল করছো তুমি, এই সবে সম্প্রদান হলো, এখনও অনেক অনুষ্ঠান বাকি আছে, বেয়াইমশাই সারাদিন উপবাসী, তুমি পরে এসো, তোমার সব কথা শুনবো।
আশুবাবু প্রায় জোড়হাত করবার উপক্রম করলেন।
কিন্তু মেয়েটি তখনও অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
কন্যাকর্তা হাঁক দিলেন—বাহাদুর—
সমস্ত বাড়ি যেন কেঁপে উঠলো। সে-কি গম্ভীর গলা। সমস্ত বরযাত্রীর দল যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। আর দেরী নেই। এবার একটা না একটা কিছু ঘটবে। তখন সম্প্রদান হয়ে গেছে প্রায়।
পুরুতমশাই হাত মুছে হোমের ওপর শেষ কয়েক ফোঁটা ঘি ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। হল-ঘরের মধ্যে কয়েকশো লোক জড়ো হয়েছে। অতিথি, বরযাত্রী, আত্মীয়-স্বজন-- যারা কাছে পিঠে ছিল তারাও দৌড়ে এসেছে। সর্বনাশের ব্যাপার! কন্যাকর্তার ছেলে নেই, কিন্তু লোকবল আছে! লোকবল শুধু নয়, অর্থবলও আছে—সে যে কী ভয়ানক কাণ্ড! অটলদা—আমাদের অটলদার শেষে এই কাণ্ড! শুধু অটলদাই নয়, অটলদার সঙ্গে আমরাও যেন সব পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। অটলদার মতন আমাদেরও মুখ দিয়ে কোনো কথা আর বেরোচ্ছিল না। আমরা সব বিমর্ষ হয়ে দেখছিলাম—বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম। আমাদের অটলদা, বাদামতলার গৌরব অটলদা—সমস্ত ছাত্রদলের আদর্শ অটলদা, তাকে এমন ক'রে মিথ্যে কলঙ্ক দেওয়া! এও কী সম্ভব! বাদামতলার গঙ্গার জলে গলা ডুবিয়ে বললেও আমরা তা বিশ্বাস করবো না।
কমলদা বললে, মেয়েটার কোনও বদ্ মতলব আছে ঠিক—
বিশুদা বললে, এখান থেকে ভাগিয়ে দিলেই হয়—
আমারও যেন কেমন রাগ হচ্ছিল। অটলদার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করতে এসেছে মেয়েটা। ওই কালো কুচ্ছিৎ মেয়েটা কিনা অটলদার বউ! ভাবতেই যেন গা-ঘিন্-ঘিন্ করতে লাগলো। অথচ সামনেই ব'সে আছে নতুন বউ, বেনারসীর ঘোমটা ঢাকা, হোমের আগুনের আভা লেগে মুখটা তখনও লাল টক্-টক্ করছে—কী চমৎকার দেখাচ্ছে! হঠাৎ যেন গুন্-গুন্ ক'রে গুঞ্জন সুরু হলো চারিদিকে। সে-গুঞ্জন ক্রমে গোলমালে পরিণত হলো। আর গোলমালের মধ্যে কতরকম মন্তব্য শুনতে পেলাম কতরকম লোকের মুখ থেকে।
কেউ বলছে, মেয়েটা বদ্মাইস্—বদ্মায়েসির জায়গা পায়নি আর?

—মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হোক্ না।
আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে একজন বললেন, আমি পুলিশকে টেলিফোন ক'রে দিচ্ছি।
আর সহ্য করতে না পেরে কন্যাকর্তা বললেন, বেয়াইমশাই, তাহ'লে আপনি কী বলেন?
আশুবাবু বললেন, দাঁড়ান বেয়াইমশাই, আমি একটু বুঝিয়ে বলি।
মেয়েটি তখনও চুপ ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
আশুবাবু বললেন, মা, আমি অটলের বাপ, আমি বলছি, তোমার কথা কাল আমি সব শুনবো—এখন তুমি বরং এসো, এখানে গোলমাল ক'রে তোমার কী লাভ?
মেয়েটি বললে, আমি এ বিয়ে হতে দেবো না।
আশুবাবু বললেন, কিন্তু সম্প্রদান তো হয়েই গেছে। সম্প্রদান হলেই তো বিয়ে হওয়া হলো!
মেয়েটি বললে, না, এ বিয়ে হয়নি।
পাশ থেকে কে যেন টিট্‌কিরি কাটলে একবার, তুমি বললেই হয় নি। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।
আশুবাবু তাকে ইঙ্গিতে শান্ত হতে ব'লে আবার বলতে লাগলেন, বিয়ে হয়নি মানে?
মেয়েটি বললে, কারণ, একবার এই বরের সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়ে গেছে।
—কবে বিয়ে হয়েছে?
মেয়েটি আরও মরিয়া হয়ে উঠেছে তখন।
বললে, আপনি প্রমাণ চান?
আশুবাবুর অসীম ধৈর্য!
বললেন, মেনে নিলাম বিয়ে হয়েছে আপাততঃ, কিন্তু তুমি একটা প্রমাণ দেখাবে আর আমিও অমনি তা বিশ্বাস ক'রে নেবো, তা তো হতে পারে না। তার সাক্ষী চাই, সাবুদ চাই। তুমি কাদের মেয়ে, তোমার বাড়ি কোথায়, তোমার বাবার নাম কী সবই তো জানতে হবে।
মেয়েটি বললে, সবই আমি জানাতে প্রস্তুত।
—তা তুমি জানাতে প্রস্তুত হ'লে কী হবে, আমাদের যে হাতে এখন অত সময় নেই, এখনও অনেক বরযাত্রীর খাওয়া বাকি আছে।
মেয়েটি বললে, যা হবার আজকেই হোক্, কালকের জন্যে আমি অপেক্ষা করতে পারবো না।
—তা তোমার বাবার নাম কী? কোন্ গোত্র?
মেয়েটি তেমনি উত্তেজিত হয়েই বলতে লাগলো, দেখুন, গোত্র-টোত্র আমি জানি না, জানতে চাই না। আমি শুধু জানি আমাদের দু'জনের বিয়ে হয়েছে। আমি অনেক দূর থেকে আসছি, শেষ মুহূর্তে খবর পেয়েছি, তাই দৌড়তে-দৌড়তে আসছি—এখনও আমার খাওয়া হয়নি।
—তা আমাদেরই কী খাওয়া হয়েছে? আমরাও তো সারাদিন উপোস ক'রে আছি, তা জানো?
মেয়েটি বললে, আপনারা উপোস ক'রে আছেন কিনা তা আপনারাই জানেন—

আমার তা জানবার দরকার নেই।
—তবে তুমি কী চাও শুনি ?
মেয়েটি বললে, আমি ওকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো।
আশুবাবু এবার যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।
বললেন, এত বড় দুঃসাহস তোমার !
কন্যাকর্তা এতক্ষণ সব সহ্য করছিলেন। এবার আর পারলেন না চুপ ক'রে থাকতে। কে যেন আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে একজন আবার বললে, পুলিশে ফোন ক'রে দেবো জ্যাঠামশাই ?
সামান্য মেয়েটার স্পর্ধা দেখে সবাই যেন অবাক হয়ে গেছি আমরা।
হঠাৎ মেয়েটি আর-এক কাণ্ড ক'রে বসলো।
হঠাৎ অটলদার হাত ধ'রে বললে, চলো তুমি, চলে এসো।
অটলদা মুখ নিচু ক'রে যেমন বসে ছিল, তেমনি বসেই রইলো। ওঠবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না তার।
মেয়েটা আরও জোরে হাত ধরে টানতে লাগলো।
বললে, ওঠো, উঠে এসো, চলো আমার সঙ্গে। আমাকে এতটুকু জানালে না পর্যন্ত তুমি, ভেবেছিলে আমি কিছুই টের পাবো না ? ভাগ্যিস্ খবরটা পেলুম, তুমি আমার কী সর্বনাশ করছিলে বলো তো ?
সবাই বিমূঢ় দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে দেখছিলাম। আমাদের সকলেরই মুখে যেন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ভাবছিলাম, অটলদা তবে কি সত্যিই বিয়ে করেছে ওই কালো কুচ্ছিৎ মেয়েটাকে ! যদি করেই থাকে তো কেন করতে গেল ? কিসের মোহ ? অটলদা শেষে কি আমাদের এমন ক'রে মুখ পোড়ালো ?
কন্যাকর্তা এতক্ষণ যদিও-বা কোনোরকমে সহ্য করতে পেরেছিলেন, এবার আর পারলেন না। চিৎকার ক'রে উঠলেন আবার, বাহাদুর—

তখন তো ডায়েরি রাখতাম না। তাই দিন তারিখ ক্ষণের হিসেব নেই। শুধু মনে আছে, সেদিন, সেই অটলদার বিয়ের রাত্রে সমস্ত বরযাত্রীর দল আমরা যেন মরমে মরে গিয়েছিলাম লজ্জায়। একী করলে অটলদা ! এমন ক'রে মুখ পোড়াতে হয় নিজের, আর সেই সঙ্গে আমাদের !
মনে আছে ১৯৪২ সালে—তার অনেক বছর পরে যখন আমার দেখা হলো অটলদার সঙ্গে, তখন আমি লজ্জায় অনেকক্ষণ সে-কথা বলতে পারিনি।
ঘাটশিলায় গিয়েছিলাম একটা সভায় সভাপতিত্ব করতে। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ চলছে। বোমা পড়ছে কলকাতায়। ছন্নছাড়া হয়ে গেছে কলকাতার মানুষ। যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। সেই দুঃসময়ের মধ্যেও সভা-সমিতি ! ছেলেরা কিছুতেই ছাড়েনি। কিছুতেই তাদের হাত থেকে রেহাই পাইনি আমি। অগত্যা বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছিল আমাকে ঘাটশিলায়।

বাংলাদেশই বলা যায়। অথচ বাংলাদেশও নয়। তবু অনেক বাঙালি আছে তখন সেখানে। অনেকে বাড়ি করেছে। কেউ-কেউ কলকাতায় কিছুদিন থাকে, আবার কিছুদিনের জন্যে ঘাটশিলায় পালিয়ে যায়। এমনি অবস্থা তখন। সেইখানকার স্কুলেরই মিটিং।
সভাপতিত্ব করেছিলাম আমি যথারীতি। যেমন বানানো কথা, বানানো বক্তৃতা সবাই করে, তেমনি আমিও করেছিলাম। ফুলের মালা পরেছিলাম গলায়, ফটোও তুলতে দিয়েছিলাম! অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি হয়নি। কিন্তু ফেরবার সময় একটা ঘটনা ঘটলো।
সেকেণ্ড-টিচার অক্ষয়বাবু বললেন, আমাদের হেড-মাষ্টারের সঙ্গে আপনার আলাপ করানো হলো না। তাঁর বড় অসুখ, তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'লে তিনি খুবই সুখী হতেন।
বললাম, কে তিনি?
অক্ষয়বাবু বললেন, তিনি এ-স্কুলের প্রাণ, কিন্তু বড্ড অসুস্থ এখন। তাঁর চেষ্টাতেই এ-স্কুলের এত উন্নতি হয়েছে।
তারপর একটু থেমে বললেন, ওই দেখুন তাঁর ছবি।
চেয়ে দেখলাম, দেয়ালে টাঙানো একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ফটো। চেহারাটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠেছি!
অটলদা না! জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের হেড-মাষ্টারের নাম কি?
অক্ষয়বাবু বললেন, অটলবিহারী বসু।
মনে আছে, সেই টিনের চালের ঘরের মধ্যে ব'সে আমি শুধু চেয়ে চেয়ে সেদিন অটলদার সংসারটার চেহারাই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলাম। একটা ময়লা হ্যারিকেন, জল-চৌকির ওপর বুঝি একটা কোন্ ঠাকুর-দেবতার পট। আর একধারে একটা তক্তপোষ, তার ওপর ছেঁড়া মাদুর পাতা। মাথার দিকে একটা ময়লা তেলচিটে বালিশ। আর সারা তক্তপোষময় বই ছড়ানো। কতরকমের যে বই, কত কী বিচিত্র বই, তারও যেন কোনো ইয়ত্তা নেই।
মনে আছে, এক ফাঁকে আমি বলেছিলাম, আচ্ছা অটলদা—
অটলদা বলেছিল, কী বলবি বল?
বললাম, তোমার দুঃখ হয় না?
—দুঃখ?
আমার দিকে চেয়ে প্রথমটা অটলদা যেন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু আমার চোখের জল বোধহয় আমি লুকোতে পারিনি। এই দারিদ্র্য, এই ময়লা কুৎসিৎ নোংরা আবহাওয়াতে যেন কেমন অস্বস্তি লাগছিল। কোথায় সেই আলিপুরে ফুলের বাহারওয়ালা বাড়ির মালিক হবার কথা! কোথায় বিলেত যাবে অটলদা! কোথায় ব্যারিষ্টারি প'ড়ে এসে অটলদা বিরাট গাড়ি চ'ড়ে বেড়াবে! কোথায় সমস্ত দেশের লোক ছুটে এসে অটলদার পায়ের ধুলো নেবে! ছোটবেলা থেকে তো এই চিত্রই মনের মধ্যে এঁকেছিলাম। আর শুধু কি আমি! বাদামতলার সবাই তো একদিন সেই কল্পনাই করতো। সবাই তো জানতো আশুবাবুর পুত্র-ভাগ্য ভালো। আশুবাবু মহৎ সন্তানের

বাপ! আশুবাবুকে আর থলি হাতে বাজার করতে যেতে হবে না। বিরাট বাড়ি উঠবে আশুবাবুর। ছেলের গৌরবে আশুবাবুর গৌরব বাড়বে সকলের কাছে। কিন্তু পরে কতদিন দেখছি অটলদাদের সেই ভাঙা বাড়িটা। আস্তে-আস্তে তা ভেঙে যেতে লাগলো, খ'সে-খ'সে যেতে লাগলো। কতদিন অটলদার বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়তাম। সেই অটলদার ঘরখানার দিকে তাকাতাম। ঘরের জানালাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ থাকতো, অটলদা চলে যাবার পর থেকে একদিনও সেগুলো আর খুলতে দেখিনি।

আশুবাবু তখনো ঠিক তেমনি করেই বাজারে যেতেন। বলতাম, দিন, আপনার থলিটা দিন কাকাবাবু, আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি—

কিন্তু কিছুতেই দিতেন না থলিটা।

বলতেন, না-না, আমি ঠিক পারবো—কেমন আছেন তোমার বাবা?

বলতাম, আপনি কেমন আছেন?

—ভালই তো আছি।

জিজ্ঞেস করতাম, অটলদা কোথায়?

আশুবাবু বলতেন, কী জানি বাবা, কোথায় যে আছে, আমায় একটা খবরও দেয় না।

অটলদার বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, কাকীমা রান্নাঘরে রান্না করছেন।

আমার পায়ের শব্দ পেয়ে পেছন ফিরতেন। বলতেন, কে?

বলতাম, আমি কাকীমা।

কাকীমা বলতেন, এসো বাবা, কী মনে ক'রে?

কিছু বলতে পারতাম না।

তারপর কাকীমাই বলতেন, অটলকে দেখতে এসেছো, সে তো নেই।

সে তো নেই! সে তো নেই! সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে যেন এই কথাটাই ভেসে বেড়াতো—সে তো নেই। অটলদা নেই, সে-কথাটা যেন কেউই ভুলতে পারতাম না। কিন্তু আস্তে-আস্তে যেমন সবই সহ্য হয়ে যায়, তেমনি সমস্তই সহ্য হয়ে গিয়েছিল—সবাই ভুলে গিয়েছিলাম। আশুবাবু কাকীমা সবাই ভুলে গিয়েছিলেন। ভুলে না গেলে চলবে কেন? ভুলে না গেলে মানুষ বাঁচবে কী ক'রে?

আশুবাবুকে দেখতাম, এক-একদিন বিকেলবেলা পার্কের ভেতরের রাস্তাটা ধ'রে একটা লাঠি নিয়ে হাঁটছেন। সামনে দিয়ে গেলেও আর চিনতে পারতেন না। চোখে আর ভালো দেখতে পেতেন না তখন।

সামনে গিয়ে নমস্কার করতাম। পায়ের ধুলো নিতাম।

বলতেন, কে বাবা তুমি?

বলতাম, অটলদার কোনও খবর পেয়েছেন?

বলতেন, ও, তুমি? না বাবা।

বলতাম, আপনি একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন না কেন ?

আশুবাবু হাসতেন। কিছু বলতেন না।

শেষে হঠাৎ একদিন শেষরাত্রের দিকে খবর পেলাম, কাকীমা মারা গেছেন। আমরা সবাই তাঁকে নিয়ে গেলাম শ্মশানে। ছেলে নেই, আমরাই মুখাগ্নি করলাম। শেষকৃত্য করলাম। তার পর আবার যেমন ক'রে চলছিল পৃথিবী তেমনি করেই চলতে লাগলো।

আশুবাবু তেমনি করেই এক-একদিন লাঠি নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন।

আমার সঙ্গে দেখা হলে বলতেন, আমার আর দুঃখ কিসের বাবা ? কেন দুঃখ করতে যাবো আমি ?

সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, কিন্তু অটলদারই-বা কেমন স্বভাব, একটিবার খবর পর্যন্ত নিলে না!

আশুবাবু হাসতেন।

বলতেন, না-ই বা নিলে বাবা, মনে করবো ছেলে আমার হয়নি, বুঝবো ছেলে হয়েছিল, সে মারা গেছে।

ঘাটশিলায় অটলদার কাছে ব'সে আমার সেইসব কথাই মনে পড়তে লাগলো কেবল। এমন ক'রে যে নির্দয় হতে পারে, তার কাছে আমি কী অভিযোগ করবো ?

অটলদার স্ত্রী এসে এককাপ চা দিয়ে গেল।

অটলদা বললে, এই শোনো শোনো—

অটলদার স্ত্রী দাঁড়িয়ে গেল। তার দিকে মুখ তুলে চাইতেও যেন সাহস হচ্ছিল না। মুখ তুলে চাইতেও যেন—সত্যি বলতে কি, ঘৃণা হচ্ছিল। সমস্ত গোলমালের মূল তো এই অটলদার স্ত্রীই।

রাগে আমার মুখ দিয়ে সত্যিই কথা বেরোচ্ছিল না।

অটলদা বললে, ইনিই তোর বৌদি, প্রণাম কর্।

ইচ্ছে হচ্ছিল না, তবু প্রণাম করলাম।

বৌদি বললেন, আপনার বই পড়েছি আমি, বেশ লেখা আপনার।

চুপ করেই ছিলাম মাথা নিচু করে।

মনে আছে, অটলদা যখন অনেক কথা বলছিল তখন হঠাৎ এক সময়ে বললাম, কাকাবাবু কেমন আছেন তা জিজ্ঞেস করলে না তো অটলদা ?

কাকাবাবু!

অটলদা কাকাবাবুর নামটা শুনে কেমন থেমে গেল হঠাৎ!

বললাম, তোমার কি মায়া-দয়া কিছুই নেই অটলদা ? তুমি এমন পাথর হতে পারলে কী ক'রে। তুমি তো আগে এমন ছিলে না ?

অটলদা কী যেন ভাবতে লাগলো। হঠাৎ যেন মনে প'ড়ে গেল বাড়ির কথা। যেন হঠাৎ তার এতদিন পরে স্মরণশক্তি ফিরে এলো। অটলদা বইগুলোর পাতায় হাত

বুলোতে বুলোতে কী যেন বিড়-বিড় করতে লাগলো। মনে হলো, হঠাৎ যেন আচম্‌কা তার মনের কোন গোপন তারে আঘাত দিয়েছি। আর আঘাত দিতেই যেন সমস্ত যন্ত্রটা জুড়ে একটা ঝঙ্কার উঠেছে।
আবার বললাম, ছোটবেলা থেকে তুমিই তো আমাদের আদর্শ ছিলে অটলদা—তুমি ছাড়া আর কোনও আদর্শকে আমরা জানতাম না—তা তো তুমি জানো!
অটলদা যেন অন্যমনস্কের মত বই-এর পাতাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো।
বললাম, ছোটবেলা থেকে বাদামতলার আমরা সব ছেলেরা বড় হয়ে তোমার মত হবো এই কথাটাই ভাবতাম। তাও তো তুমি জানো।
অটলদা তবু কিছু বললে না। মুখ নিচু ক'রেই ব'সে রইলো।
বললাম, তোমার বাবা, কাকীমা শেষজীবনে কত কষ্ট পেয়েছেন তা তুমি জানো? তা তুমি কল্পনা করতে পারো? বলো, উত্তর দাও?
অটলদা তবু কোনো কথা বললে না। যেন মাথাটা আরও নিচু করলে শুধু।
বললাম, কিন্তু তুমি তো আগে এমন ছিলে না অটলদা! তুমি তো বরাবর এ সব অপছন্দ করেছো, যেখানে অন্যায় সেখানেই তো তুমি তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে প্রতিবাদ করেছো।
অটলদা তবু চুপ করে রইলো।
বললাম, অমন চুপ করে থাকলে তোমার চলবে না অটলদা—তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথার উত্তর দাও একবার।
বললাম, বলো, আজ স্বীকার করো তুমি, কেন এমন হলো? কে এর জন্য দায়ী? কর্তব্য করেছো তুমি কার ওপর? কে সে? সে কি কাকাবাবুর চেয়েও বড় কেউ? কাকীমার চেয়েও বড়?
অটলদা এবার যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো।
বললাম, ভয় নেই অটলদা, আমি তোমায় তার নাম জিজ্ঞেস করবো না। কিছুই জিজ্ঞেস করবো না।
অটলদা হঠাৎ আমার হাতদুটো ধ'রে ফেললে।
বললে, শোন্‌, আজ তুই থাক্‌ আমার কাছে।
বললাম, কেন?
অটলদা বললে, তোর সব কথার উত্তর আমি দেবো। তুই আজকে আমার এখানে থাক্‌।
বললাম, তোমার এখানে থাকবো?
অটলদা বললে, কেন, খুব কাজ আছে তোর?
কাজের কথা নয়। কিন্তু চারিদিকে চেয়ে কেমন যেন সঙ্কোচ হলো। কোথায় থাকবো? এই ঘরে? এই ছেঁড়া বিছানা আর ময়লার রাজ্যে? দু'খানা মাত্র ঘর বোধহয়। ওপাশ থেকে রান্নার শব্দ আর গন্ধ আসছে নাকে! এখানে থাকবো?
অটলদা বললে, আজ তুই থাক্‌, নতুন বই কিনেছি একটা, এই দ্যাখ্‌, পড়াবো তোকে।
নতুন বই-এর লোভ আমার ছিল না। অটলদার নতুন বই-এর লোভ এখনও থাকতে পারে। কিন্তু আমার লোভ অটলদার ওপর। কেন অটলদার সব থাকতেও এই

দারিদ্র্য বরণ ক'রে নিয়েছে। কিসের জন্যে? কার জন্যে? যাকে দেখেছি সেদিন সেই আলিপুরের বিয়ে-বাড়িতে, তারই এত আকর্ষণ? তারই এত মোহ? অন্ধকারে মিলের ময়লা শাড়ি-পরা তার চেহারা তো আজও দেখলাম! তার মধ্যে এত কী আকর্ষণ পেলো অটলদা! যে-অটলদা ভোররাত্রে উঠে মনের জোর বাড়াবার জন্যে দেওয়ালের গায়ে আঁকা দাগের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতো, যে অটলদা স্বামী বিবেকানন্দের 'ব্রহ্মচর্য' প'ড়ে নিজেকে উন্নত করেছিল, তারই কী এই মর্মান্তিক পরিণতি! ইস্কুলের হেড-মাস্টার হয়েছে ভালো কথা! ছেলেদের মানুষ করছে, তাও ভালো কথা। কিন্তু নিজে? নিজে কী আজ পৃথিবীর মানুষেব সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে? মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পারবে—আমি যা-কিছু করেছি, সব ন্যায় করেছি, যা-কিছু ভেবেছি সব ঠিক ভেবেছি!

অটলদা বললে, তাহ'লে তোর বৌদিকে ব'লে দিই, তুই এখানে খাবি আজ।

তারপর ভেতরের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললে, ওগো শুনছো—

অটলদার ডাক শুনে আবার সেই মহিলাটি এলো।

অটলদা বললে, শুনছো, এ-ও থাকবে আজ এখানে, বুঝলে? এই আমার ঘরেই বিছানা ক'রে দিও।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, একটু কষ্ট হবে তোর।

বৌদি বললেন, আপনি রাত্রে ভাত খান, না রুটি খান?

বললাম, আমার জন্যে আপনাকে বেশি ভাবতে হবে না, আপনারা যা খাবেন আমিও তাই খাবো।

বৌদি হেসে ফেললেন। বললেন, আপনি বুঝি আমার কষ্টের কথা ভাবছেন? রাঁধতে কষ্ট হয় নাকি মেয়েদের?

অটলদা বললে, ওকে দুটো বেগুনভাজা ক'রে দিও, বুঝলে।

বৌদি বললেন, হ্যাঁ, তুমি বেগুনভাজা খেতে ভালোবাসো ব'লে কী সবাই তাই ভালবাসে?

বাধা দিয়ে বললাম, না-না, বৌদি, আপনার যা খুশী তাই আপনি দেবেন, আমার খাওয়ার কোনো বাদ-বিচার নেই।

বৌদি চলে যাবার পর অটলদা বললে, তোর হয়তো এখানে একটু কষ্ট হবে।

—না-না, কষ্ট হবে কেন? তুমি কিছু ভেবো না অটলদা।

অটলদা বললে, না, এখানে আজকাল বড় মশা হয়েছে।

বললাম, তা হোক্, আজ তোমার সব কাহিনী শুনবো অটলদা, কেন এমন হলো? কিসের জন্যে তুমি এমন ক'রে পালিয়ে বেড়াচ্ছো?

অটলদা বললে, পালিয়ে বেড়াচ্ছি? কে বললে তোকে?

বললাম, তুমি কী বলছো অটলদা? পালাওনি তুমি? তোমার যা শক্তি ছিল, তোমর যা ক্ষমতা ছিল, তোমার যা প্রতিভা ছিল, তার জোরে তোমার তো এখন সকলের নমস্য হ'য়ে থাকার কথা, সকলের উদাহরণস্থল হয়ে থাকার কথা।

অটলদা হাসতে লাগলো।

বললে, কেন, এখন কী সকলের চোখে ছোট হয়ে গেছি আমি?

বললাম, হওনি? কী তুমি হতে পারতে ভাবো দিকিনি? কিসের তোমার অভাব

ছিল বলতে পারো ?
অটলদা মুখ নিচু ক'রে যেন ভাবতে লাগলো।
বললে, বলবো আজ রাত্তিরে তোকে সব, আজ তো আছিস্ তুই ?

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় অন্যরকম। নইলে আমিই কি জানতাম যে, এতদিন পরে দেখা হ'লেও অটলদার কাহিনী আমার শেষ পর্যন্ত শোনা হবে না। সেদিন আলিপুরের বাড়িতে বিয়ে হবার দিনও যেমন সমস্ত ঘটনাটা রহস্যাবৃত হয়ে আছে, ঘাটশিলার সেই ইস্কুলের মাষ্টারি-জীবনের আড়ালেও সব কাহিনীটা আমার চিরকালের মতই অজানা রয়ে গেল। অটলদা কি শান্তি পেয়েছিল তার জীবনে ? অনেক-বার অনেক অবসরের মধ্যে ব'সে ব'সে ভেবেছি। একদিন এক মুহূর্তের জন্যেও কি অনুতাপ করেনি অটলদা ?
কিন্তু সে-কথা জানবার কোনো উপায় ছিল না। তারপরে কতবার কতদিকে গিয়েছি। ঘাটশিলার স্টেশনের ওপর দিয়েও কতবার গিয়েছি তার ঠিক নেই। অনেকবার মনে হয়েছে—নামি। নেমে দেখা ক'রে আসি অটলদার সঙ্গে। কিন্তু সেবার যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল জীবনে, তার জন্যে আর কখনও সাহস হয়নি ঘাটশিলায় যেতে। চিঠি লিখে খবর নিতেও সাহসে কুলোয়নি।
সেই কাহিনীটাই আজ বলি।
সে-রাত্রে ঘাটশিলায় থাকাই সাব্যস্ত করেছিলাম। এক ঘরে এক তক্তপোষে অটলদার সঙ্গে কাটাবো, অটলদার জীবনের কাহিনী শুনবো, সেইরকম ইচ্ছেই ছিল। ঘর থেকে হাত-মুখ ধোবার জন্যে বাইরের উঠোনে আসতে কোন্‌দিকে জলের বালতি খুঁজছিলাম, হঠাৎ বৌদি কাছে এলেন। বললাম, এই বালতির জলে হাত ধোব বৌদি ?
বৌদি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কেন এলেন এখানে ?
গলার শব্দটা শুনে চমকে উঠলাম। হঠাৎ গলায় যেন ঝাঁজ বেরোতে লাগলো। বৌদি বললেন, কেন আপনারা আসেন আমার বাড়িতে ? কেন আসেন বলতে পারেন ?
আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। অন্ধকারে অস্পষ্ট মুখটা যেন বড় বিরক্তিভরা মনে হলো। বলতে লাগলেন—সবাই মিলে আপনারা আমার সর্বনাশ করতে কেন আসেন, আমি আপনাদের কী ক্ষতি করেছি ? কী এমন অন্যায় করেছি ?
বললাম, আমি ? আমাকে বলেছেন ?
—হ্যাঁ, আপনাদের সবাইকে বলছি ! আপনারা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন কেন ? আমি কী করেছি আমি আপনাদের ? আমার নিজের স্বামীকে নিয়ে আমি এখানে সংসার পেতেছি, তাতে আপনাদের এত রাগ কেন ?
আবার বললাম—আপনি কী বলছেন ?

মহিলাটি বললেন—কেন, আপনি বোঝেন না কিছু ? আমার সংসারের অবস্থা দেখেও বুঝতে পারেন নি ? আমার এই ছেঁড়া শাড়ী, এই ভাঙা তক্তপোষ, ময়লা মশারি, কিছুই কি আপনি দেখতে পাননি ? আপনাদের কী চোখ নেই ? এর পরেও এখানে থাকবার, এখানে খাবার কি প্রবৃত্তি আপনাদের হয় ?

আমতা-আমতা ক'রে বললাম, কিন্তু আপনিই তো আমাকে থাকবার কথা, খাবার কথা বললেন একটু আগে ?

মহিলাটি হঠাৎ যেন রেগে গেলেন। বললেন, আপনি কিছুই বোঝেন না বলতে চান ? কিন্তু এও আমি ব'লে রাখছি, আপনারা ওঁকে কিছুতেই পাবেন না, অনেকদিন ধ'রে ওঁকে আমি আপনাদের কাছ থেকে আগলে-আগলে রাখছি—যেটুকু আছে ওঁর তাও আমি নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবো।

—তার মানে ?

মহিলাটি বলতে লাগলেন, তার মানে আপনারা ভালো করেই বোঝেন। আপনারা ভাবেন, একদিন সংসারের খাটুনি-খাটতে-খাটতে যখন আমি মরে যাবো, আপনারা তখন যার জিনিস তাঁর কোলে ওঁকে তুলে দেবেন—সে আমি হতে দেবো না।

বললাম, এ আপনি কী বলছেন ?

মহিলাটি বললেন, ঠিকই বলছি আমি, আমি কাউকে ভয় করি নাকি ! আমার কিসের ভয় ? গরীবের মেয়ে ব'লে আমি কিছু কম বুঝি ? আমি কি কিছু কম জানি ?

তারপর একটু থেমেই বললেন, আপনি চলে যান এখান থেকে, আপনার দু'টি পায়ে পড়ি, আপনি জ্বালাবেন না আমাদের—

—আমি চলে যাবো ?

—হ্যাঁ, আপনি এখুনি চলে যান, একটা রাত না-খেয়ে থাকলে আপনি আর মরে যাবেন না, স্টেশনে গিয়ে রাতের ট্রেনেই চলে যান। ওঁর বাবা এসেছিলেন, তাঁকেও এমনি ক'রে আমি এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি—কেন, বিয়ে করেছি ব'লে আমি কী এমন মহাপাপ করেছি ভগবানের কাছে ?

বললাম, পাপের কথা তো বলিনি ! আপনি কেন ও-সব কথা তুলছেন ?

মহিলাটি যেন কাঁদতে লাগলেন। বললেন, অপরাধ করেছি ? পাপের কথা তুলে আমি অপরাধ করেছি ? অপরাধ যদি করেই থাকি তো ঠিকই করেছি—তার জন্যে কারোর কাছে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই। এখন আপনি যান এখান থেকে ! আমি ওঁর চেনা লোকদের মুখ আর ওঁকে দেখাতে চাই না। আমি চাই না আমার শ্বশুরবাড়ির লোক কেউ এখানে আসুক। শ্বশুর-শাশুড়ী মারা গেছে—তবে আপনারা কেন জ্বালাতে আসেন মিছিমিছি ?

বললাম, অটলদার বাবা-মা তো অটলদার শোকেই মারা গেছেন।

মহিলাটি বললেন, ভালোই হয়েছে, আপদ চুকেছে !

হঠাৎ ভেতর থেকে অটলদার গলা শোনা গেল।

—কই গো, হাত-পা ধোবার জল দিয়েছো ?

আমি বললাম, ওই দেখুন অটলদা কী বলছেন—

মহিলাটি বললেন, সে আমি বুঝিয়ে বলবো'খন, আপনি যান—এখন বেরোন এখান

থেকে।
ব'লে একরকম প্রায় জোর করেই আমাকে ঠেলে দরজার বাইরে বের ক'রে দিলেন।
বললাম, কিন্তু অটলদা রাগ করবেন নিশ্চয়!
মহিলাটি বললেন, ও'র কথা আপনাদের আর দয়া করে ভাবতে হবে না, তার জন্যে আমি আছি—আপনি যান।
বলেই দরজাটা ঝপাং ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন আমার চোখের সামনে। আর আমি ঘাটশিলার সেই অন্ধকারের মধ্যে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর সে-রাত্রে কখন ট্রেন এসেছে, কখন ট্রেন ছেড়েছে আর ট্রেনে ব'সে কখন কলকাতায় চলে এসেছি কিছুই মনে ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল, যে অটলদাকে এতখানি শ্রদ্ধা করতাম, ভালোবাসতাম, সে-অটলদা কোথায় হারিয়ে গেল! সেন অটলদাকে আমরা এ-ভাবে হারালাম!
মনে আছে, তারপর কলকাতায় ফিরে এসে অনেকবার ভেবেছি কথাটা সকলকে বলবো। কিন্তু কাকেই-বা বলবো? যাকে চিনতাম, যাকে ভালোবাসতাম, সে তো নেই, সে তো মারা গেছে।
শুধু এইটুকু মাত্র শুনেছিলাম যে, বিয়ের রাত্রের পর অটলদার নতুন বউ-ই আর কোনও সম্পর্ক রাখেনি অটলদার সঙ্গে। অটলদার বড়লোক শ্বশুর জামাইকে ত্যাগ করেছিলেন। আর তারপর সংসারের নানা উত্থান-পতনের ছন্দে কে কোথায় তলিয়ে গিয়েছিলাম, তার সংবাদ কেউ-ই রাখতে পারেনি। আমাদের কারো তেমন অবসর ছিলও না।
এমন তো কত হয়, কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব একদিন হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যায়, আর তাদের সাক্ষাৎ মেলে না জীবনে। তেমনি কত অনাত্মীয় অপরিচিতও আবার আপন হয়ে ওঠে—অনাত্মীয়ই পরমাত্মীয় হয়ে ওঠে! সুতরাং অটলদার কথা, তার বাবা-মার কথা, তার বিবাহিত স্ত্রীর কথাও আর মনে পড়েনি। বাদামতলা ছেড়ে কত পাড়া, কত পরিবেশ বদলে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে নতুন পাড়ায় এসে উঠছিলাম, তাও আগে থাকতে কিছুই জানা ছিল না।
তাই আজ এতদিন পরে সেই ঠিকানাটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।
ভুবনবাবু বললেন, আপনার যদি পছন্দ হয় তো আমার আপত্তি নেই।
তা আমার উপরেই যখন ভার, তখন আর-একবার ডেকে পাঠালাম ইন্দুলেখা দেবীকে। ইস্কুলের পিওনের হাত দিয়ে চিঠি পাঠালাম। লিখে দিলাম আর-একদিন যদি আসেন তো আরো কয়েকটি জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে, তা আমাদের জানা বিশেষ দরকার।
সত্যিই আমার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল—এত যাদের টাকা ছিল, বাপের সেই একমাত্র মেয়ের হঠাৎ কেন চাকরির দরকার হলো! সেই সময়েই তো শুনেছিলাম তার বাবার অনেক টাকা ছিল। লোহার কারবার। বাবা মারা যাওয়ার পর কি সেই সমস্ত টাকা নষ্ট হয়ে গেছে? শুধু এইটুকু শুনেছিলাম যে, স্বামীকে ত্যাগ করার পর অটলদার স্ত্রী আবার নাকি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত আছে। ম্যাট্রিকটা পাশ করা ছিল—তারপর কোনো কলেজেও ঢুকেছে। কিন্তু সে যে বি-এ পাস করেছিল, তা তো আমার জানা ছিল না।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলাই শ্যামবাজারে গেলাম। আমাদের পুরনো বন্ধু অধীর। অধীর বোস। বললাম, শুনেছো—আমাদের অটলদার খবর?

অধীর কর্মঠ লোক। চারদিকের খবরাখবর রাখে। স্বাস্থ্যও ভালো। অবসরও আছে প্রচুর। বললে, অটলদার কোন্ খবর?

বললাম, অটলদার দ্বিতীয় স্ত্রী এসেছিল আমাদের পাড়ার ইস্কুলে চাকরির জন্যে—কেন বলো তো?

অধীর এতটুকু অবাক হলো না। বললে, কেন, তুমি শোনোনি?

বললাম, ওদের তো অবস্থা ভালোই ছিল শুনেছিলাম। অতবড় লোহার কারবার, বিরাট বাড়ি—বাবা মারা যাবার পর সব নষ্ট হয়ে গেছে নাকি?

অধীর বললে, সব তো নষ্ট করেছে ঐ অটলদাই।

সে-কী! আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম—তখনও কোথায় বুঝি অটলদার ওপর আমার কী এক দুর্লঙ্ঘ আকর্ষণ ছিল! চেহারায় কিংবা চোখে, কে জানে! অধীরের কথায় অবাক হয়ে গেলাম আমি।

বললাম, তারপর? আমি তো জানতাম না কিছু।

অধীর এতও খবর রাখতে পারে!

অধীর বললে, ঘাটশিলার স্কুলে একবার আমাদের টেক্সট্ বই ধরাতে গিয়েছিলাম। সেইখান থেকেই খবরটা জোগাড় করেছিলাম।

অধীরের বই-এর দোকান। নানা রকম পাঠ্য বই ছাপিয়ে নানা স্কুলে চালাবার চেষ্টা করে। এই সূত্রে তাকে নানা জেলায় নানা গ্রামে ঘোরাঘুরি করতে হয়। প্রথমবারে গিয়ে অবশ্য বুঝতে পারেনি যে, অটলদা ওই ঘাটশিলার স্কুলেই আছে। কিন্তু কথাবার্তার পর ধরা পড়লো। আর তারপর যতবার গিয়েছে ততবারই কিছু-কিছু খবর জোগাড় ক'রে এনেছে। অটলদা ছিল আমাদের সকলের আদর্শ ছেলে। সেই অটলদার খবর পেতে কার না কৌতূহল হয়! তারপর যে-সব খবর সে সংগ্রহ করেছিল, তা সত্যিই গোপনীয়। এতদিন পরে সেই কাহিনী নিয়ে গল্প লিখছি জানতে পারলে সত্যিই অনেকেই ক্ষুন্ন হতো। কিন্তু এখন আর ক্ষুন্ন হবার কেউ নেই। এখন সে-নাটকের শেষ-অঙ্কের শেষ-দৃশ্যের শেষ যবনিকা প'ড়ে গেছে বলেই এ-কাহিনী লিখতে পারছি।

যা হোক, যে-কথা বলছিলাম।

আমাদের মতন বোধহয় ইন্দুলেখা দেবীও তখন অটলদার সন্ধান করছিলেন। বোধহয় অনেক জায়গাতে খোঁজও নিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও না-পেয়ে হয়তো হতাশই হয়ে গিয়েছিলেন। শেষকালে আমাদেরও যা হয়েছিল, ইন্দুলেখা দেবীরও তাই হলো। অর্থাৎ ইন্দুলেখা দেবী একদিন গিয়ে হাজির হলেন ঘাটশিলায়।

ভেতর থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করলে, কে?

ইন্দুলেখা বললে, আমি।

—আমি কে ? নাম নেই ?
বলতে-বলতে যে বেরিয়ে এলো তাকে ইন্দুলেখা চিনতে পারলে। কুন্তি দেবী। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার আগেই একেবারে ভেতরে ঢুকেই পড়েছে। একেবারে অটলদার শোবার ঘরের মধ্যে।
অটলদা বুঝি তখন আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বই পড়ছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখে বললে, তুমি ?
আর কিছু কথা বলার প্রয়োজন ছিল না কারোর। তবু অটলদা বললে, হঠাৎ এলে যে ?
ইন্দুলেখা বললে, আমার বাবা মারা গেছেন আজ ছ'মাস হলো—
অটলদা বললে, বয়েস হয়েছিল তাই মারা গেছেন, তা আমি তার কী করতে পারি ?
ইন্দুলেখা বললে, তুমি আবার কী করবে, তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক ?
অটলদা বললে, তা এই খবরটা বলতেই কি এতদূর এলে ?
ইন্দুলেখা বললে, নেহাত পাগল না হ'লে কেউ ওই খবরটুকু বলতে এতদূর আসে ?
অটলদা বললে, তা বলবে তো মুখ ফুটে, কেন এসেছ তুমি ?
ইন্দুলেখা বললে, নিশ্চয় বলবো, না বললে তুমি যে জিতে যাবে! ভেবেছো, আমাকে হারিয়ে দিয়ে তুমি সংসারের কাছে বাহবা কুড়িয়ে বেড়াবে ?
অটলদা বললে, আমার বাহবা নেবার কথা থাক্।
ইন্দুলেখা বললে, তখন ছোট ছিলাম তাই বুঝিনি, কিন্তু এখন বড় হয়েছি, এখন বুঝেছি কী তোমার মতলব।
—কী বুঝেছো ?
সমস্ত ঘরখানা যেন থম্‌থম্ করতে লাগলো। ঘরের আলনা, বিছানা, তোরঙ্গ—সব যেন কেমন সজীব হয়ে উঠল। বাইরের জানালা দিয়ে একটা চড়াই পাখি ঘরে ঢুকে পড়েছিল, সেও যেন আর সহ্য করতে পারলে না।
ইন্দুলেখা বললে, তোমার সঙ্গে আমার তো শুধু সম্পত্তির লেন-দেনেরই সম্পর্ক—আর কিসের সম্পর্ক থাকতে পারে বলো ?
অটলদা বললে, এতদিন পরে তুমি সেটা বুঝলে ?
—নির্লজ্জের মত তুমি সেটা স্বীকার করতে পারলে তা'হলে ?
অটলদা বললে, তোমাকে বিয়ে করতে যাওয়াটাই একটা নির্লজ্জতা হয়েছিল—সে-কথা কে-না জানে! আজ স্বীকার করলে কি সে নির্লজ্জতা কিছু কমবে ?
ইন্দুলেখা বললে, কিন্তু এই অবস্থায় দিন কাটিয়ে সেই নির্লজ্জতাকেই তো ঢাকা দিতে চাইছো, আমি বুঝি না কিছু ?
অটলদা বললে, আমার যে অবস্থাই হোক, তবু তোমার কাছে তো আমি ভিক্ষে করতে যাইনি।
ইন্দুলেখা বললে, ভিক্ষে চাইবার মতই যে তোমার অবস্থা তা-ও তো দেখছি, কিন্তু কেন যে ভিক্ষে চাওনি, তাও আমি জানি!
অটলদা বললে, কী জানো বলো ?
ইন্দুলেখা বললে, তাই বলতেই তো এসেছি—আর কেন এতদিন আসিনি তাও বলবো। যে-সম্পত্তির জন্যে তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে, সেই সম্পত্তি না নিয়ে

ভেবেছ, তুমি খুব জিতে যাবে ?

—তার মানে !

ইন্দুলেখা বললে, বড় অহংকার তো তোমার ?

অটলদা বললে, কী বলতে এসেছ স্পষ্ট ক'রে বলো !

—স্পষ্ট করেই তো বলছি, অনেক চিঠি তোমায় লিখেছি, একখানারও তো উত্তর দাওনি। ভেবেছো, ভুগে-ভুগে না-খেয়ে, না-প'রে মরবে, আর তোমার শোকে সবাই কাঁদবে, না ?

অটলদা বললে, তোমার একটা চিঠিও পেয়েছি ব'লে তো মনে পড়ছে না আমার। কিন্তু সে যাক্‌গে, সে চিঠিতে কী লিখেছিল তুমি ?

—শুনুন !

হঠাৎ পেছন থেকে মেয়েলি-গলায় ডাক আসতেই ইন্দুলেখা পেছনে তাকালে। দেখলে, কুন্তি দেবী দাঁড়িয়ে আছে দরজার চৌকাঠের ওপর।

বললে, কী ?

মহিলাটি বললে দেখছেন মানুষটার আজ একবছর ধ'রে অসুখ, আর এসব কী বলছেন আপনি ?

ইন্দুলেখা বললে, কেন, একবছর ধ'রে যদি অসুখ তো ডাক্তার ডাকা হয়নি কেন ? আর ভালো ডাক্তার ডাকার পয়সা না থাকে তো আমার কাছে টাকা চাওনি কেন তোমরা ?

তারপর অটলদার দিকে চেয়ে বলতে লাগলো, সম্পত্তির জন্যেই তো আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল তোমার বাবা, আর আজ সেই টাকা চাইতে এত লজ্জা ?

—চোপরাও !

হঠাৎ যেন বোমা ফেটে পড়লো ঘরের ভেতর। অটলদার গলাতে যে এত জোর থাকতে পারে, তা যেন আগে কেউ কল্পনাই করতে পারেনি।

কিন্তু এত সহজেই যদি হার মানবে ইন্দুলেখা তবে সে ইন্দুলেখাই বা হয়েছিল কী করতে ?

সে-ও গলা চড়িয়ে বললে, চুপ করতে বলছো তুমি কাকে ?

অটলদা বললে, তোমাকে !

ইন্দুলেখা বললে, চুপ করে থাকবো ব'লে তো এখানে আসিনি। আজ চুপ ক'রে থাকবার পালা আমার নয়, আমি আজ নিজের দাবী জানাবো বলেই এসেছি। আর সে-দাবী আমি জোর গলায় চেঁচিয়ে বলবো বলেই এসেছি।

অটলদা বললে, তা কি তোমার দাবী, বলো ? ব'লে এখান থেকে চলে যাও।

ইন্দুলেখা বললে, শুধু দাবী জানানো নয়, তার প্রতিকারও আমি চাইবো।

অটলদা বললে, তা বলো, কি দাবী তোমার, বলো ?

ইন্দুলেখা বললে, তোমরা দু'জনে মিলে কি এমনি করেই আমার জীবনটা নষ্ট ক'রে দেবে ? আমি কি কেউ নই ? আমি কি তোমাদের কেউ-ই-নই ? আমাকে কি তুমি অগ্নিসাক্ষী ক'রে বিয়ে করোনি ?

অটলদা বললে, আমি তো বলেছি, সে আমার লজ্জা !

—সে যদি তোমার লজ্জা হয় তো আমার কী ? তোমার লজ্জার ফল আমি ভুগবো

কেন ? তার জবাব দাও আমাকে ?

অটলদা খানিকক্ষণ জবাব দিতে পারলে না এ-কথার।

তারপর বললে, কি খেসারত পেলে তুমি আমাকে মুক্তি দেবে, বলো ? আমি তা-ই দেবো।

ইন্দুলেখা গর্জে উঠলো।

বললে, নির্লজ্জ ভীরু কোথাকার! কোন মুখে তুমি মুক্তির কথা বলতে পারলে ? তোমার যদি মুক্তি হয় তো এই সমস্ত সবকিছু মিথ্যে। ভগবান মিথ্যে, চন্দ্র-সূর্য মিথ্যে, এই পৃথিবীটাই মিথ্যে!

অটলদা একটু থেমে বললে, তুমি কী চাও এখন তাই বলো—আমার শরীর খুব খারাপ।

ইন্দুলেখা বললে, আমি চাই তোমাকে সারিয়ে তুলতে।

অবাক হয়ে গেল কুন্তি দেবী। সারিয়ে তুলতে!

সামনে বাজ পড়লেও যেন এতটা অবাক হতো না কুন্তি দেবী। যে তেজী মেয়ে কুন্তি দেবী, সেও আজ যেন কেমন ম্রিয়মান হয়ে গেল। তার মুখ দিয়েও আর কোনো কথা বেরোলো না হঠাৎ।

ইন্দুলেখা বলতে লাগলো, তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করবে, কেন আমি তোমাকে সারিয়ে তুলতে চাইছি! আমার এত-বড় সর্বনাশ যে করেছে, তাকে সারিয়ে তুলে আমার লাভ কী ? লাভ আমার আছে বলেই তোমাকে আমি সারিয়ে তুলতে চাই, তোমাকে সারিয়ে না তুললে আমার যে মুক্তি হবে না!

অটলদা যেন কিছু বলতে পারলে না। বললে, তার মানে ?

ইন্দুলেখা বললে, তার মানে যদি তুমি বুঝবে, তাহ'লে আমার কপালে এত দুর্ভোগ হবে কেন ? তার মানে তোমার বুঝেও দরকার নেই।

হঠাৎ অটলদার দিকে নজর পড়তেই ইন্দুলেখা দেখলে, মানুষটা যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে উত্তেজনার মধ্যে! এতক্ষণ বসেই ছিল অটলদা। এবার যেন টলছে। তারপর টলতে-টলতে বিছানার ওপর ঢ'লে পড়লো। আর সঙ্গে-সঙ্গে মুখ দিয়ে গল্-গল্ ক'রে রক্ত পড়তে লাগলো! ইন্দুলেখা সঙ্গে-সঙ্গে পেছন ফিরে বললে, কী দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? একজন ডাক্তারকে ডাকুন।

কুন্তি বললে, ও ওঁর নতুন নয়।

—নতুন নয় তো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখলেই চলবে ? একটা পিক্‌দানি কি কিছু দিন—না'হলে মানুষটা মারা যাবে যে।

কুন্তি তবু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। বললে, আপনি এখানে থাকলে ওঁকে বাঁচাতে পারবো না, আপনি চলে যান—

ইন্দুলেখা বললে, চলে যাবো ব'লে তো আমি আসিনি।

—কিন্তু যদি ওঁর ভালো চান তো এখানে থাকা আপনার চলবে না।

ইন্দুলেখা বললে, এ অবস্থায় ওকে ফেলে রেখে তো আমি চলে যেতে পারবো না—আপনি হাজার বললেও না।

—তাহ'লে কি চোখের সামনেই ওঁর মৃত্যুই আপনি দেখতে চান ?

ইন্দুলেখা বললে, আমি কী চাই সে আপনাকে ভাবতে হবে না, ওঁর ভালো-মন্দ—

আমার নিজেরও ভালো-মন্দ, তার চেয়ে আমি নিজেই দেখি কী করতে পারি।
ব'লে ইন্দুলেখা নিজেই অটলদার মাথার কাছে ব'সে মাথাটা কোলে ক'রে নিয়ে বসলো।
তারপর নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে অটলদার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে মাথার ওপর পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো। সে এক আশ্চর্য মূর্তি ইন্দুলেখা দেবীর!
কুন্তি দেবী সেই চেহারার দিকে চেয়ে হতবাক্ হয়ে রইলো।
আর তার পরদিন থেকে সেই রুগী, সেই সতীন, আর সেই সংসারের ভার পড়লো—ইন্দুলেখা দেবীর ওপর।

এবার গল্পটা থামিয়ে অধীর এক গ্লাস জল চাইলো।
কিন্তু আবার আমি বললাম—তারপর?
অধীর বোস এবার গল্পটা পুরো বললে।
তারপর বললে, শেষে অটলদা আমাদের সেই হিরো অটলদা, দ্বিতীয় পক্ষের বউ-এর টাকা ধ্বংস ক'রে খেতে লাগলো। ওষুধ, ডাক্তার, বাড়িভাড়া সব জোগাতে লাগলো ওই ইন্দুলেখা দেবী।
—তারপর?
অধীর বললে, তারপর আজ পুরী, কাল ওয়ালটেয়ার এই তো করতো! বাপ মারা যাওয়ার পর থেকেই লোহার কারবার চলে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কে যা টাকা ছিল, সেই টাকা ভাঙিয়ে-ভাঙিয়ে চলছে! আমাদের সেই অটলদার যে শেষকালে এমন পরিণতি হবে ভাবতে পারিনি ভাই! বউ-এর টাকায় কিনা অটলদার সংসার চলে?
মনে-মনে ভাবলাম, হয়তো তাই হবে। অধীর বোসের কথাই হয়তো সত্যি। টাকাকড়ি ফুরিয়ে এসেছে, এখন চাকরির দরকার হয়েছে ঐ অটলদার জন্যেই।
অধীর জিজ্ঞেস করলে, চাকরি দিলে নাকি শেষ পর্যন্ত?
বললাম, দেখি, কী উত্তর আসে, কাল একবার আসতে বলেছি। ভাবছি জিজ্ঞেস করবো, তাঁর চাকরি করবার কী দরকার?
ভেবেছিলাম, আমার চিঠি পেয়ে পরদিনই চলে আসবেন ইন্দুলেখা দেবী। ভুবনবাবুকেও ব'লে রেখেছিলাম—এ মহিলাটি আমার পরিচিত। এঁকেই চাকরিটা দিন। ভুবনবাবুও রাজী ছিলেন। কিন্তু যে-সময় আসার কথা সে-সময়ে এলেন না। দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, কখন দেড়টা বেজে গেছে। অথচ খবরটা ঠিক সময়েই দেওয়া হয়েছিল লোক মারফত। বেলা তখন দুটো, তখনও খবর এলো না।
যখন বেলা তিনটে বাজলো তখন ইন্দুলেখা দেবী এলেন।
চেহারাটা কেমন যেন উস্কোখুস্কো। দেখে মনে হলো, যেন সারারাত ঘুম হয়নি তাঁর। আমি তাঁর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার শরীর খারাপ নাকি ?
তিনি বললেন, না।
বললাম, আপনাকেই আমরা এই পোস্টের জন্যে সিলেক্ট করেছি। আপনি যথাসময়েই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাবেন।
তাঁর চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার আভাস ফুটে উঠলো। তিনি আমাকে নমস্কার ক'রে চ'লে গেলেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন, আপনি যে আমার কী উপকার করলেন তা মুখে বলে প্রকাশ করতে পারবো না।

শুধু সিলেক্‌শানের ভারই ছিল আমার ওপর, আর কিছু নয়, তারপর আমি আর কেউ নই। স্কুলের সঙ্গে আমার নিজের কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। তাই আমি আমার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। স্কুল-কমিটির কেউই নয় আমি। স্থায়ী সেক্রেটারী ভুবনবাবু ছুটি থেকে ফিরে এসে আমার কাছে একদিন এলেন।
জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখছেন ইন্দুলেখা দেবীকে ? টিচার-সিলেক্‌শান কেমন হয়েছে বলুন ?
ভুবনবাবু বললেন, অত্যন্ত ভালো এত ভালো, টিচার আমাদের স্কুলে আর নেই।
—কী রকম ?
ভুবনবাবু বললে, ভদ্রমহিলা অদ্ভুত পাঙ্‌চুয়াল। একদিনের জন্যেও কামাই নেই ওঁর।
বললাম, কিন্তু আমি একটা রিস্ক্‌ নিয়েছিলাম।
—কী রিস্ক্‌ ?
বললাম, ভদ্রমহিলার স্বামী ভদ্রমহিলাকে ত্যাগ করেছেন, তাই আমার একটু ভয় হয়েছিল।
ভুবনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কিসের ভয় ?
বললাম, হয়তো আপনাদের স্কুলের মেয়েদের চরিত্রে কিছু রিফ্লেক্‌শন করতে পারে।
ভুবনবাবু বললেন, না মশাই, বরং ঠিক তার উল্টো। ও-রকম আদর্শ চরিত্রের মহিলা-টিচার আমি তো আগে কখনও দেখিনি।
আমি অবাক হয়ে গেলাম একটু। স্কুলে এত মহিলা-টিচার থাকতে ইন্দুলেখা দেবীকেই বা কেন এত আদর্শস্থানীয়া মনে হলো, তাও বুঝতে পারলাম না।
বললাম, কী জন্যে আপনার মনে হলো ও-কথা, বলুন তো ? কিসের আদর্শ-স্থানীয়া ?
ভুবনবাবু বললেন, খুব সাদাসিধে পোষাক-পরিচ্ছদ। চা, পান কোনও নেশা নেই, ছাত্রীদের ক্লাসে খুব যত্ন নিয়ে পড়ান, আমাদের হেডমিস্ট্রেসও খুব খুশী ওঁর ওপর, তাছাড়া ছাত্রীরাও ওঁকে খুব ভক্তি করে, এবং ভালবাসে।
বললাম, যাক্‌, আমার নির্বাচন যে ভালো হয়েছে, তাই-ই ভালো, আমার সেই-

জন্যেই একটু ভয় ছিল।
সত্যিই কয়েকদিনের মধ্যে বেশ সুনাম ছড়িয়ে গেল ইন্দুলেখা দেবীর। সকলেই ইন্দুলেখা দেবীর কাছে পড়তে চায়। বাড়িতেও ইন্দুলেখা দেবী কয়েকজন ছাত্রীকে পড়াতে লাগলেন। সকালে বাড়িতে ছাত্রী পড়ানো, রাত্রেও বাড়ীতে ছাত্রী পড়ানো। দুপুরবেলা স্কুল।
ভুবনবাবুও মাইনে বাড়িয়ে দিলেন।

একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। তিনি তখনস্কুলে যাচ্ছিলেন। বেশ ঘোমটা দিয়ে কোনোদিকে দিক্‌পাত না ক'রে নিচু-মুখে রাস্তার দিকে চেয়ে চলেছেন। একবার ভাবলাম, ডেকে কথা বলি। কিন্তু আবার ভাবলাম এ উচিত নয়। নিঃসম্পর্কীয়া মহিলার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা অভদ্রতা। দেখলাম, আটপৌরে একটা শাড়ি। একজোড়া সাধারণ চটি পায়ে। সাধারণ ব্লাউজ। মাথায় ছোট ছাতা।
একবার ইচ্ছে হলো, জিজ্ঞেস করি—অটলদার খবর কী? অটলদা কেমন আছে? কিন্তু আমার এ-প্রসঙ্গ হয়তো ইন্দুলেখা দেবী স্বচ্ছন্দভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না, তাই ভেবেই আমি তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম।
পরে ভুবনবাবুর কাছেই শুনলাম সব।
তিনি বললেন, শুনেছেন কাণ্ড?
বললাম, কিসের কাণ্ড?
—আপনার ইন্দুলেখা দেবীর কাণ্ড।
বললাম, না। কিছু শুনিনি তো।
ভুবনবাবু বললেন, দেবী মশাই, দেবী। ইন্দুলেখা আসলে মানুষ নন্, দেবী।
ব'লে তিনি সমস্ত ইতিবৃত্ত ব'লে গেলেন। কেমন দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন তিনি। কেমন ক'রে স্বামীর কাছ থেকে অবহেলা, অত্যাচার, অনাদর পেয়েছেন। সমস্ত কাহিনী। তারপর সেই রুগ্ন স্বামীর জন্যে কেমন ক'রে পৈত্রিক সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি খরচ করেছেন। যে স্বামী তাঁকে বিয়ের প্রথম দিনটি থেকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই স্বামীর জন্যেই কীভাবে তিনি নিজের বিলাস-ব্যসন অর্থ, স্বাস্থ্য সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন। সেই স্বামীকেই তিনি কতবার কত স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠিয়েছেন, কত বড়-বড় ডাক্তার ডাকিয়ে দেখিয়েছেন, কত দামী-দামী ওষুধ কিনে খাইয়েছেন, সব কাহিনীই বললেন।
শেষে ভুবনবাবু বললেন, সত্যি আজকালকার সমাজে এমন পতি-ভক্তি দেখা যায় না মশাই, এ যে সাক্ষাৎ দেবী একেবারে।
বললাম, আমি সব জানি।
—আপনি সব জানেন?
ভুবনবাবু শুনে অবাক হয়ে গেলেন।
বললেন, আপনি সমস্ত জানতেন?

বললাম, জানতাম বলেই তো ওঁকে এই পোস্টের জন্যে সিলেক্ট্ করেছিলাম।

ভুবনবাবু বললেন, আজ পনেরো বছর ধ'রে এইরকম ক'রে স্বামীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এ তো বড় কম কথা নয় মশাই আজকাল কোন্ স্ত্রী এ-রকম করতে পারে, বলুন ?

বললাম, তা তো বটেই।

ভুবনবাবু বললেন, আমি ভাবছি মশাই, এ রকম পতিব্রতার একটা সম্বর্ধনা হওয়া উচিত—আপনি কী বলেন ?

বললাম, আপনারা যদি তাই মনে করেন তো করুন, আমার কোনো অসম্মতি নেই।

ভুবনবাবু বললেন, কিন্তু ইন্দুলেখা দেবী যে আপত্তি করছেন, তিনি বলছেন তাঁর এতে অমত আছে। তিনি বলেছেন, আমি স্বার্থত্যাগ করেছি আমার রুগ্ন স্বামীর জন্যে সম্বর্ধনার কী দরকার !

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি যদি একটু রাজী করাতে পারেন, দেখুন না।

বললাম, আমার সঙ্গে যে ওঁর স্বামীর পরিচয় আছে, সেটা আমি জানাতে চাই না।

—তাহ'লে এক কাজ করুন।

ব'লে ভুবনবাবু আর একটা প্রস্তাব দিলেন।

বললেন, তাহ'লে আমরা যদি পাবলিকের কাছে কিছু চাঁদা তুলে ওঁর রুগ্ন স্বামীর জন্যে সাহায্য করি ?

আমার মনটা তাতে খুশী হলো।

বললাম, সে তো ভালোই, তাতে আমার আপত্তি নেই।

ভুবনবাবু বললেন, তাহ'লে সেই প্রস্তাবটাই করি ওঁকে—কী বলেন ?

তা সেই ব্যবস্থাই হলো। কিছুদিনের মধ্যে ভুবনবাবুর চেষ্টাতেই হাজারখানেক টাকা চাঁদা তোলা হলো। কম-বেশী সবাই কিছু-কিছু দিলেন। আমিও দিলাম পাঁচ টাকা। ভুবনবাবুও দিলেন শ'খানেক টাকা। আমার এতে আনন্দ হবারই কারণ ছিল। অটলদা—আমাদের সেই ছোটবেলাকার অটলদার জন্যে আরো বেশি কিছু করতে পারলেও খুশী হতাম আমরা।

অনুষ্ঠানটা গোপনভাবেই হলো। কারণ, ইন্দুলেখা দেবী এ নিয়ে জাঁক-জমক কিছু করতে চান না। তিনি হাত পেতে টাকাটা নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন। বললেন প্রার্থনা করুন, যেন আমার স্বামী তাড়াতাড়ি আরোগ্যলাভ করেন।

তারপর হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, অটলদা কলকাতায় এসেছে। অধীর বোসই খবরটা দিলে। অটলদা পেনড্রা-রোডের টি-বি স্যানিটোরিয়ামে ছিল, সেখান থেকে কলকাতায় আনিয়েছেন ইন্দুলেখা দেবী।

বললাম, তাহ'লে অটলদা নিশ্চয় সেরে উঠেছে ?

অধীর বোস বললে, না সেরে উঠলে আর কলকাতায় নিয়ে আসবে কেন ?

বললাম, ঠিকানাটা তুমি জানো ?

অধীর বোসই অটলদার ঠিকানাটা দিলে। তার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েই আমি গেলাম বউবাজারের একটা বাড়িতে।
কলকাতায় এত বাড়ি থাকতে এই পাড়ায়, এই অন্ধকার ঘুপচির মধ্যে কেন বাড়ি-ভাড়া নিলে কে জানে! আর কোনও ভালো আলো-হাওয়া রোদওয়ালা বাড়ি পেলে না?
অন্ধকার ড্যাম্প ঘরখানার মধ্যে বহুদিন পরে অটলদাকে দেখে সেবারকারই মত অবাক হয়ে গেলাম। যিনি দরজা খুলে দিয়েছিলেন, বুঝলাম, তিনিই সেদিনের সেই বৌদি কুন্তি দেবী। তাঁর চেহারা আরো বদলে গিয়েছে।
বললাম, আমায় হয়তো আপনি চিনতে পারছেন?
বৌদি বললেন, না।
বললাম, আমি বহুদিন আগে ঘাটশিলাতে গিয়েছিলাম অটলদাকে দেখতে—আমি অটলদার সঙ্গে একই স্কুলে পড়তাম।
—আপনি কেন এসেছেন?
বললাম, শুনলাম, অটলদা এখানে আছেন, তাই একবার দেখতে।
—কী দেখবেন তাঁর?
বললাম, কেন, তাঁর সঙ্গে কি দেখা করা নিষেধ?
—না, নিষেধ নয়। কিন্তু তাঁকে দেখলে তিনি হয়তো আরো অনেকদিন বেঁচে যেতে পারেন।
আমি কথাটা শুনে প্রথমে একটু চমকে উঠলাম। কথাটার মানে বুঝতে যেন আমার একটু দেরি হলো। বললাম, তার মানে?
বৌদি বললেন, তার মানে তাঁর তাড়াতাড়ি মরে যাওয়াই ভালো।
—কেন?
বৌদি বললেন, মারা গেলেই তিনি শান্তি পাবেন। আর আমিও তাই চাই।
আবার অবাক হয়ে বললাম, আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।
বৌদি বললেন, আমি দিনরাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাড়াতাড়ি মারা যান, তাঁর কষ্ট আমি আর চোখে দেখতে পারছি না!
—আপনি বলছেন কী?
বৌদি বললেন, হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি, মারা যাওয়াই তাঁর পক্ষে মঙ্গল, তাতে আমারও মঙ্গল।
—কিন্তু আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি শুনেছিলাম, অনেকদিন ধ'রে তাঁর চিকিৎসা হচ্ছে, অনেক টাকা খরচ হচ্ছে চিকিৎসার জন্যে। আরো শুনেছিলাম, একজন তাঁর জন্যে তাঁর নিজের সমস্ত সম্পত্তি বেচে তার চিকিৎসার খরচ চালাচ্ছে, তিনি নিজেও উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন অটলদার জীবন বাঁচাবার জন্যে?
বৌদি বললেন, ভুল শুনেছেন।
বললাম, না বৌদি, ভুল নয়, আমাদের পাড়ার একটা স্কুলে তিনি চাকরি করছেন। আমরা—পাড়ার লোকেরা সবাই মিলে তাঁর স্বামীর চিকিৎসার জন্যে এক হাজার টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছি।

বৌদি বললেন, আপনারা ভুল করেছেন। অতবড় জোচ্চোর, অতবড় নিষ্ঠুর অতবড় নীচ মেয়েমানুষ আমি জীবনে আর দেখিনি। আমি সামনে পেলে তাকে খুন ক'রে ফেলতাম।

আমার অবাক হবার যেন তখনও অনেক বাকি ছিল।

বললাম, আপনি রাগের মাথায় কার সম্বন্ধে কী বলছেন এ-সব ?

বৌদি বললেন, আপনি জানেন না বলেই এই কথা বলছেন, জানলে আর তাকে সোহাগ ক'রে হাজার টাকা চাঁদা তুলে দিতেন না। জানেন, সে কতবড় বেহায়া নীচ মেয়েমানুষ ?

বললাম, কিন্তু আমরা তো তাঁকে ভালো মহিলা বলেই জানি। তাঁর স্বামীর জন্যে তিনি সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

—আপনারা কিছু জানেন না, তাই। জানলে তাকে ঝাঁটা মেরে স্কুল থেকে বিদেয় করতেন।

—কেন ?

বৌদি বললেন, তবে শুনুন, এতবড় নীচ মেয়েমানুষ যে, স্বামীর ওপর একটু দয়া-মায়াও নেই শরীরে। বাইরের লোক জানে যে, স্বামীর জন্যে ওই মেয়ে সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছে, কিন্তু অতবড় নিষ্ঠুর মেয়েমানুষ ভূ-ভারতে আর জন্মায়নি। আমি ওঁর দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখি আর অবাক হয়ে যাই। মানুষটা হয়তো বেঁচে যেত, কিন্তু ওই পোড়ারমুখীর হাতে যে দিন থেকে পড়েছে, সেদিন থেকে আর ওঁর বাঁচবার কোনও আশা নেই।

বললাম, সে কী ?

—হ্যাঁ, লোকে যেমন ইঁদুরকে আধমরা ক'রে জীইয়ে রেখে মজা পায়, এও তেমনি ওষুধ পত্তর, টাকা-কড়ি সব কিছু দিচ্ছে। দরকার হ'লে চেঞ্জেও পাঠাচ্ছে। এই সেদিন ওয়ালটেয়ারে পাঠিয়েছিল ছ'মাসের জন্যে, পুরীতে রেখেছিল দু'বছর, এবার পেনড্রা-রোডে তিন বছর ধ'রে টি-বি স্যানিটোরিয়ামে রেখেছিল—

বললাম, কিন্তু তার জন্যে তো সব খরচ তিনিই দিচ্ছেন ?

—তা তো দিচ্ছেই, আজ পর্যন্ত কত হাজার, কত লক্ষ টাকা যে খরচ করেছে, তার কোনো হিসেবই নেই। হাজার-হাজার টাকা খরচ ক'রে আমাকে আর ওঁকে পাঠিয়েছে সব জায়গায়। যেখানে যত ডাক্তার আছে, সকলকে পয়সা দিয়ে ডেকে ওঁর চিকিৎসা করিয়েছে। যেখানে যত ওষুধ পাওয়া যায় সব কিনিয়ে দিয়ে খাইয়েছে—কখনও কোনো চিকিৎসার কিছু ত্রুটি রাখেনি—

বললাম, তাহ'লে ? তাহ'লে কেন ও-কথা বলছেন, মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন তাঁর নামে ?

—দোষ দেবো না ? তাহ'লে সারছে না কেন ? এত ওষুধের পরেও সারছে না কেন ওঁর অসুখ ?

বললাম, অসুখ সারা কি মানুষের হাতের মধ্যে ?

—না, সে জন্যে নয়, সারলে যে আমার কপালে সুখ হবে তাই।

—কিন্তু তিনি তো সারিয়েই তুলতে চাইছেন আপনার স্বামীকে ?

বৌদি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, বললেন, সেই কথাই সবাইকে শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু

আসল উদ্দেশ্য কী জানেন ?
বললাম, আপনিই বলুন না, আসল উদ্দেশ্য তো স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলা, সুস্থ ক'রে তোলা—আর কী ?
বৌদি বললেন, না, আসল উদ্দেশ্য তা নয়।
বললাম, তাহ'লে আসল উদ্দেশ্য কী স্বামীর মৃত্যু ঘটানো ?
—না, তা-ও নয়।
—তবে ?
বৌদি বললেন, আসল উদ্দেশ্য হলো, মানুষটাকে না-মরা, না-বাঁচা অবস্থায় রাখা। সারা জীবন যেন এই রকম পঙ্গু-অথর্ব হয়ে থাকে, এই-ই সে চায়।
—সে কী ?
—হ্যাঁ, নইলে যেই চিকিসায় একটু সেরে ওঠার মত অবস্থা হয়, অমনি কেন চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেয় ? সেবার ওয়ালটেয়ারে শরীরের বেশ উন্নতি হচ্ছিল ও'র। যেই খবরটা পেয়েছে, অমনি বললে, আর ওয়ালটেয়ারে থাকতে হবে না। চলে এসো। আর কিছুদিন ওখানে থাকলে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যেতেন। কিন্তু তা তো ওর সহ্য হবে না। আর-একবার একটা ওষুধে বেশ কাজ হচ্ছিল। খুব দামী ওষুধ। যেই দেখলে সত্যি-সত্যিই মানুষটা বেঁচে উঠেছে, অমনি টাকা পাঠানো বন্ধ করলে।
তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—এই তো এবার, পেনড্রা-রোডের স্যানিটোরিয়ামে তিন বছর রাখলে, বেশ ওজন-টোজন বাড়তে লাগলো, ক্ষিধে হ'তে লাগলো, কিন্তু যেই সে-খবর কানে গেল, অমনি চিঠি লিখলে—চলে এসো এখানে, আর টাকা পাঠাতে পারছি না।
আমি কথাগুলো শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরোচ্ছিল না।
অনেক পরে বললাম, তাহ'লে আসল উদ্দেশ্যটা কী ?
—উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, মজা দেখা। ইঁদুরকে যেমন আধমরা ক'রে রেখে লোকে মজা দেখে, এও তাই। ছেড়েও দেবে না, অথচ মেরেও ফেলবে না—এ এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর আনন্দ। ওকে আমি খুন করতে পারলেই মনের সাধ মেটাতে পারতাম।
এর পর আমার আর কিছু বলবার ছিল না। চলে আসবার আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা এখন কেমন আছেন অটলদা ?
বৌদি খানিক থেমে উত্তর দিয়েছিলেন, এত কথা শোনার পরেও আপনি এই কথা জিজ্ঞেস করছেন ?
যাহোক, অটলদা তখন ঘুমোচ্ছিল। দূর থেকে তাকে দেখেই সেদিন চলে এসেছিলাম। কোনও কথা বলবার সুযোগ আমার হয়নি অটলদার সঙ্গে।

এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার। ঠিক এ-ধরণের কোনও গল্প কোনও উপন্যাসেও পড়িনি। এমনও যে হতে পারে তা যেন কল্পনা করতেও পারি না। মনে-মনে

কদিন বড় অশান্তিতে কাটালাম। এ কেমন ক'রে হয় ? এমনি ক'রে আর-একটা সংসারের সর্বনাশ লোকে কেমন ক'রে করতে পারে ? আর এতে কি ইন্দুলেখা দেবী নিজেই শান্তি পেয়েছে। আমিও অনেক মোটা-মোটা উপন্যাস লিখেছি। ভেবেছি আমিই বুঝি মানুষ-চরিত্রটা বুঝি, ভেবেছি মানুষের নাড়ি-নক্ষত্র সবই বুঝি আমার জানা। তাছাড়া পৃথিবীর অনেক উপন্যাসই তো প'ড়ে দেখেছি। সেক্সপীয়র থেকে আরম্ভ ক'রে টলস্টয়, বালজাক, মোঁপাশা, গোর্কী কিছুই তো বাদ দিইনি। শুনেছি বালজাক নাকি 'The greatest creator of human characters next to God'। কিন্তু তাঁর বইতেও তো এমন চরিত্র একটাও নেই। তবে কি কুন্তি দেবী মিথ্যে কথা বললে ? সবই রাগের কথা ? নিজের সতীনের ওপর নিজের মনের ঝাল মেটাতে চেয়েছে ? কী জানি। আমি অনেক মাথা খাটিয়েও এ-রহস্যের কিছু সমাধান করতে পারলাম না।

সেদিন হঠাৎ অধীর বোস বাড়িতে এসে হাজির।

অধীর বোস এমনিতে কারো বাড়ি যাবার সময় পায় না। আমার নতুন বাড়ির ঠিকানাও জানা ছিল না তার। রবিবারটা ছুটির দিন দেখে বেরিয়ে পড়েছে।

এসেই বললে, এসে পড়লাম।

আমি বললাম, সেই ব্যাপারে কোনও খোঁজ পেয়েছো ?

—কিসের খোঁজ ?

আমি বললাম, আমি ভাই সেই অটলদার ব্যাপার নিয়ে খুব চিন্তায় আছি।

অধীর বোস বললে, আমিও তো সেই ব্যাপার সম্বন্ধেই বলতে এসেছি।

তারপর সে যা বললে তা শুনে আরো অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই তো, মানুষের সংসারে কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে, মানুষের মন যে কত বিচিত্র পথে আনাগোনা করে, তার হিসেব কি বিধাতা-পুরুষই জানতে পারে ! এ পৃথিবীতে যত রকমের মানুষ, তত রকমের চরিত্র। উপন্যাস-লেখকের সাধ্য কি সকলের মন সে জানবে, সকলের মনের খবরদারি সে করবে। তা যদি হতো, তাহ'লে লেখার মালমশলাও কবে ফুরিয়ে যেত সংসারে, উপন্যাস লেখাও বন্ধ হয়ে যেত চিরকালের মতো। ফরমুলা দিয়ে যদি মনের বিচার করা সম্ভব হতো, মানুষ তাহ'লে আর মানুষ থাকতো না। মানুষও মেশিন হয়ে যেত।

সে অনেকদিন আগের কথা। এ উপন্যাসের একেবারে গোড়ার ঘটনা।

অটলদা তখন আমাদের পাড়ার মধ্যমণি। লেখাপড়ায় ফার্স্ট, আদর্শ-চরিত্র ছেলে। পাড়ায়-পাড়ায় তখন চরিত্র গঠনের আয়োজন-অনুষ্ঠান চলছে। ছোট ছেলেদের মনের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব। এখন যেমন রাজকাপুর, দিলীপকুমার, নার্গিসের নাম সকলের মুখে, তখন তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের নাম। তাঁর ব্রহ্মচর্যের বই ছেলেদের পড়তে দেওয়া হয় চরিত্র-গঠনের জন্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের

"আনন্দমঠ" ছেলেদের ক্লাবে-ক্লাবে ঘোরে। সে সেই অগ্নিযুগের শেষের দিককার কথা। পাড়ায়-পাড়ায় টেগার্ট সাহেব ঘুরে বেড়ায়। টেগার্ট সাহেব তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। স্পাই-এর জাল পাতা সমস্ত শহরে। এক-একটা পাড়ায় ঘুরে-ঘুরে দেখে আর-ছেলে-ছোকরার সঙ্গে ভাব করে। টেগার্ট সাহেবের পায়ে পাম্পশু, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পরণে দিশী তাঁতের কোঁচানো ধুতি। কোথায় কারা বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কথা বলছে, কারা ইংরেজের বিরুদ্ধে লোক খেপাচ্ছে, কারা কোথায় লাঠি-খেলা ছোরা-খেলা শিখছে, এইসব দেখে দেখে বেড়ানোই কাজ ছিল টেগার্ট সাহেবের। তারপর একদিন হঠাৎ পুলিশ এসে হানা দিত পাড়ায় আর বাছা-বাছা কয়েকজনকে ধ'রে নিয়ে যেত।
আজকের দিনে যারা ছোট, তাদের এসব জেনে রাখা দরকার। ইণ্ডিয়ার এ-স্বাধীনতা অকারণে আসেনি। কোটি-কোটি লোকের চিন্তায়, চেষ্টায়, আত্মত্যাগেই এর আবির্ভাব। আজকে আমরা নিশ্চিন্ত মনে যা-খুশী তাই করছি। যেখানে ইচ্ছে যেতে পারছি। সেদিন লাটসাহেবের বাড়ির আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করলে পুলিশ এসে ধ'রে নিতো। চৌরঙ্গীতে নিশ্চিন্ত মনে ঘোরাঘুরি করা যেত না। টমিদের ছড়ি এসে পড়তো মাথায়। অথচ তার কিছু প্রতিকার ছিল না। নালিশ করলেও কিছু হতো না। সাধারণ মানুষের পক্ষে সে ছিল অরাজক রাজত্ব।
ট্রেনে যে-কামরায় ইংরেজরা চড়তো, সেখানে ইণ্ডিয়ানদের চড়া চলবে না।
থার্ড ক্লাশ কামরাতেও দু'চারজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান থাকলে আর কোনও ইণ্ডিয়ান-দের ঢোকবার অধিকার নেই সেখানে। সে এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তখন বাস করতাম আমরা। অর্থাৎ সেই ঊনিশশো পঁচিশ-ছাব্বিশ সালে। তখন এই কংগ্রেসের সুরও ছিল নরম। আবেদন-নিবেদন ক'রে কিছু-কিছু ক্ষমতা আদায় করবার চেষ্টা করছে কেবল। বছরে একবার ক'রে এক-একটা দেশে বড় ক'রে মিটিং হতো। কিছু রেজিলিউশান পাস হতো আর লম্বা-লম্বা বক্তৃতা। যা-কিছু আসল কাজ হতো তা পাড়ায়-পাড়ায় গুপ্ত-সমিতিতে। তাদেরই বেশি ভয় করতো ইংরেজরা। আজ যারা মন্ত্রী বা যারা সরকারী উঁচু চেয়ারে ব'সে আছে, তাঁরা তার মধ্যে ছিল না। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের খয়ের-খাঁ, নয়তো এইসব ক্লাব থেকে দূরে স'রে থেকে গা বাঁচিয়েছে। তারা লেখাপড়া করেছে। ইংরেজদের আণ্ডারে ভালো সরকারি চাকরি পাবার আশায় সমস্ত স্বদেশী হাঙ্গামা থেকে আড়ালে থেকেছে। যেন তাদের গায়ে দাগ না লাগে। একবার দাগ লাগলে সরকারী পুলিশের ব্ল্যাক-বুকে তাদের নাম উঠে যাবে। তখন তারা দাগী হয়ে যাবে। কিন্তু এখন সব উল্টে গেল। এখন কংগ্রেসী আমলে তারাই গদিতে চেপে বসলো। আর যারা সেদিন দেশের কাজের জন্যে লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা শিখেছে, ক্লাব ক'রে নাইট-স্কুল ক'রে ছেলে মেয়েদের মানুষ ক'রে তোলবার চেষ্টায় নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে, তাদের আজ কেউ চিনতে পারে না। তারা এই দেশে এখনও বেঁচে রয়েছে, কিন্তু তাদের এই আজকের উৎসবের আনন্দের দিনে কেউ ডাকে না। কেউ পঁচিশ টাকা কি তিরিশ টাকা পেনশন পায়। এইমাত্র।
যাহোক, আমাদের পাড়ার অটলদা ছিল সেদিনকার সেই আদর্শবাদী ছেলেদের একজন। আর সবাই যখন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিজের কাজ গুছোবার

চেস্টায় মশগুল, তখন অটলদা আমাদের মানুষ করবার জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করছে। সে কী অমানুষিক পরিশ্রম।
আশুবাবু এটা পছন্দ করতেন না। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে তাঁরই মত কোনও অফিসে ভালো চাকরি করবে। তাঁর চেয়েও ভালো চাকরি। বিরাট গাড়ি ক'রে অফিসে যাবে। দশজনে দেখবে। যা সাধারণত সব বাবাই চাইতো তখন, তিনিও তাই-ই চাইতেন, তার বেশি কিছু নয়। আর বড়-জোর হয়তো বাড়িখানা দোতলা করবেন। মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির চরম আকাঙ্ক্ষাটুকুই তিনি চরিতার্থ করতে চাইতেন তাঁর নিজের ছেলের মধ্যে দিয়ে।
তাই মাঝে-মাঝে অনুযোগ করতেন অটলদার কাছে।
বলতেন, একটু সাবধানে চলবে বাবা, দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে।
অটলদা বুদ্ধিমান ছেলে। বাবার কথার প্রতিবাদ করেনি কখনও।
বলতো, হ্যাঁ, আমি তো বুঝে-শুনেই চলি।
আশুবাবু বলতেন, শুনছি নাকি টেগার্ট সাহেব পাড়ায় পাড়ায় ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে!
—হ্যাঁ, তা তো আমিও শুনেছি।
—তা এই সময় আর বাইরে-বাইরে না-ই বা ঘোরাঘুরি করলে—চারদিকেই তো শুনছি স্পাই ঘুরছে।
শুধু আশুবাবু কেন, অন্য লোকেরাও সাবধান ক'রে দিতো। অটলদার ভালোর জন্যেই তারা সৎ উপদেশ দিতো।
বলতো তোমার বাবার কথাও তো ভাবতে হয় বাবা, তোমার ওপরেই তো তোমার বাবার বৃদ্ধ বয়সের সব আশা-ভরসা নির্ভর করছে!
আমরাও জানতাম সে-কথা। কিন্তু আমরা তখন ছোট। আমরা তখন বুড়ো-মানুষের কথার দিকে কান দিতাম না। আমরা শিখেছিলাম, দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে অগৌরব নেই। আমরা জানতাম বৃটিশ গভর্ণমেন্টের উচ্ছেদ না হ'লে দেশের কোনো মঙ্গল নেই। আমরা দেখতাম, হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ ছেলে পাস ক'রে বেকার ব'সে আছে। তারা চাকরি পায়না কোথাও। আমরা তখন সি আর দাসের বক্তৃতা শুনি। আমরা পার্কে-পার্কে গিয়ে লেকচার শুনি। মিটিং-এর সময় পুলিশের দল লাঠি নিয়ে তৈরি থাকে। এক-একদিন হঠাৎ লাঠি চালায় তারা। মিটিং ভেঙে দেয়। অনেক লোকের মাথা ফেটে যায়। চোখ কানা হয়ে যায়। পুলিস যত অত্যাচার করে, ততই আমাদের গোঁ বেড়ে যায়। আমরা আরও মনে মনে বৃটিশ-বিরোধী হয়ে উঠি। আমরা চাই ইংরেজ তাড়াতে। আমরা চাই, একদিন আমাদের দেশ ছেড়ে ইংরেজ চলে যাবে। আমরা আর তাদের দাসত্ব করবো না। তখন চরকা কাটার যুগ নয়। চরকা কাটার যুগ চলে গেছে ১৯২০-২১ সালে। চরকা কাটা দিয়ে স্বরাজ হয়নি। এবার মেরে তাড়ানো হবে ইংরেজদের। গুলী মেরে, বোমা মেরে আর ভাতে মেরে। সঙ্গে-সঙ্গে বিলিতি বয়কট তো আছেই।
আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ পড়তাম।
স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন—"শরীর জোরালো হলে মনও জোরালো হবে।"

অটলদা সেইগুলোই আমাদের শোনাতো। আমাদের পড়তে দিত সেই সব বইগুলো। আমরা সবাই স্বামী বিবেকানন্দ হতে চাইতাম। এখনকার মত তখন সিনেমা ছিল না। থিয়েটার ছিল বটে তখন, কিন্তু সে শ্যামবাজারের দিকে। আমাদের পাড়া থেকে অনেক দূরে। সেখানে যাবার সুবিধে ছিল না। অত টাকা দিয়ে থিয়েটার দেখার সামর্থ্যও ছিল না আমাদের। আগ্রহও ছিল না মোটের ওপর।

ঠিক এই সময়েই অটলদার কাজ পড়লো বাইরে। আমাদের পাড়ার বাইরে। ছোট পাড়া থেকে শুরু হয়েছিল তার কাজ। সেই পাড়ার বাইরে ডাক পড়লো ক্রমে। সেখানেও ক্লাব করলে। কারণ স্বামীজির বাণী তো সারা দেশে ছড়াতে হবে। তবেই দেশে স্বরাজ আসবে। তবেই ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াতে পারা যাবে। আমরা জানতাম না অটলদা কোথায় কী করছে। কোথায় কোন্ পাড়ায় আবার ক্লাব করছে! কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তখন অনেক শাখা-প্রশাখা গ'ড়ে উঠেছে। সব জায়গাতেই অটলদা যায়। সব জায়গাতেই অটলদা অপরিহার্য। অটলদা না দেখা-শোনা করলে কোনও ক্লাবই চলে না।

সেই রকম একটা ক্লাবে গিয়েই এই বিপর্যয়টা ঘটলো।

বিপর্যয় মানে এমন কিছুই নয়। প্রথমটায় সেই রকমই মনে হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ তো বলেছিলেন, "যে নিজে নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্যে কাতর হয়, জীব-উদ্ধারের চেষ্টা করে, সে-ই রামকৃষ্ণের পুত্র। যে এই মহাসন্ধি পূজার সময় কোমর বেঁধে গ্রামে-গ্রামে ঘরে-ঘরে তার সন্দেশ বিতরণ করবে, সে-ই আমার ভাই, সে-ই তাঁর ছেলে। এই-ই পরীক্ষা—সে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে নিজের ভালো চায় না, প্রাণত্যাগ হলেও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী তারা। যারা নিজের আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার নিজের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজী, তারা আমাদের কেউ নয়, তফাৎ যাক।"

অটলদাও ছিল এই ছেলে।

নিজে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে কী হবে, যদি আর সকলে পিছিয়ে প'ড়ে থাকে? নিজের মুক্তি নিয়ে কী হবে, যদি আর সবাই অন্ধকার কুসংস্কারে বন্দী হয়ে থাকে? সবাইকেই যে চাই। মায়ের আহ্বানে সবাইকে একসঙ্গে সাড়া দিতে হবে। মা যে সকলের আত্মাহুতি চায়। সকলে মিলে সর্বস্ব আহুতি দিলেই তো মা আবার জাগবে, আবার চিন্ময়ী হবে! মৃন্ময়ীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে।

এইসব কথা বলতো অটলদা 'সব ক্লাবে গিয়ে!

সব ছেলে-মেয়েরা হাঁ ক'রে শুনতো অটলদার কথাগুলো। অটলদাকে দেবতার মত ভক্তি করতো সবাই।

ছেলে-মেয়ে মানে তখন বড়-বড় ছেলেরা আসতো বটে, কিন্তু মেয়েরা ছিল ছোট ছোট। ফ্রক-পরা মেয়ের দল তারা। একটু বড় হয়ে গেলেই আর তাদের আসা হতো না ক্লাবে! গার্জিয়ানরা আর আসতে দিত না তাদের। তখন তাদের বিয়ে হবার পালা। ছেলে হবার পালা। সংসার করবার পালা।

কিন্তু অটলদাকে অবিশ্বাস করা পাপ। অটলদার চরিত্রে কোনও পাপ থাকতে নেই।

একদিন কুন্তি বললে, বাবা আপনাকে একবার ডেকেছেন অটলদা।
—কেন ?
কুন্তি বললে, আপনাকে দেখতে চেয়েছেন।
হেসে ফেলে অটলদা বললে, বা রে আমাকে দেখবার কী আছে।
কুন্তি বললে, না, আপনার কথা আমি বাবাকে বলেছি কিনা।
কুন্তি বাবাকে কী বলেছিল কে জানে! একদিন কিন্তু কুন্তি আর ছাড়লে না। একেবারে টেনে নিয়ে গেল নিজেদের বাড়িতে। ভবানীপুরেও যে এমন পাড়া থাকতে পারে, তা অটলদাও বুঝি কল্পনা করতে পারেননি।
অটলদাকে দেখে ভদ্রলোক বিছানায় উঠে বসলেন।
কুন্তি বললে, আমার বাবার জ্বর হয়েছে—
— জ্বর হয়েছে, তা উঠছেন কেন ? আপনি শুয়ে থাকুন।
ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। বললেন, জ্বর আমার আজকের নয়, আজ সাত বছর ধরেই আমি জ্বরে ভুগছি—
—কেন ? ডাক্তার কী বলছে ?
ভদ্রলোক বললেন, ডাক্তারের সাধ্যি নেই আমার এ রোগ সারায়— এ আমার মনের রোগ।
বড় অবলীলাক্রমে ভদ্রলোক সব কথা ব'লে গেলেন। ভদ্রলোকের নাম মঙ্গল সরকার। বললেন, কুন্তির কাছে আপনার কথা শুনি আর ভাবি কেবল। আর তো কোনও কাজ করবার ক্ষমতা নেই আমার। শুধু শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখি। আমারও একদিন বাবা তোমার মত কাজ করবার ক্ষমতা ছিল। তাই সেদিন বললাম তোর অটলদাকে একবার বাড়িতে ডেকে আনিস তো—
তারপর একটু থামলেন। আবার বললেন, তোমাকে দেখে আমার আশা হচ্ছে বাবা —তুমি পারবে।
অটলবিহারী বসু। অটলদা আশুবাবুর ছেলে এই এত বয়সের বৃদ্ধ লোকের কাছ থেকে কখনও উৎসাহ পায়নি আগে।
বললে, আপনার মত আগে কেউ আমার কাজে উৎসাহ দেয়নি, সবাই নিন্দে করেছে —সবাই বলে আমি চাকরি নিয়ে সংসারের সাশ্রয় করলেই বেশি ভালো কাজ হতো— তাতে বাবা-মা'র উপকার হতো। আপনিই আমার কাজের প্রথম সমর্থন করলেন।
—সমর্থন কী বাবা, সে-বয়েস থাকলে আমিও তোমার সঙ্গে কাজে নেমে পড়তাম। জীবন তো একটা। কিন্তু তোমার বয়েসে আমাকেও কেউ উৎসাহ দেয়নি ব'লে আমার ক্ষতি হয়েছে বাবা, আমি হেরে গিয়েছি, আমি পারিনি, আশীর্বাদ করছি, তুমি জিতবে, তুমি পারবে।

এমনি করেই সূত্রপাত হলো কুন্তিদের বাড়ি যাওয়া। চারদিকের কাজের মধ্যেও কোথায় যেন একটা আকর্ষণ বোধ করতো অটল। অটলবিহারী বসু। ক্যালকাটা

ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট বয়।
মঙ্গলবাবু ব'লে দিয়েছিলেন, যখনই সময় পাবে তুমি এসো—দ্বিধা কোরো না।
অটলদা দাঁড়াতো। বসতো কাছে। নিজের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা অকপটে প্রকাশ করতো। মঙ্গলবাবুর কাছে তার যেন আর কোনও আড়ালই থাকতো না। মঙ্গলবাবুরও যেন একটা কথা বলার লোক মিলে গিয়েছিল এতদিনে।
মঙ্গলবাবুর নিজের জীবনও অদ্ভুত।
বলতেন, ফরিদপুরে লাটসাহেবের ট্রেনে বোমা পড়েছিল জানো তো? অনেক লোকই তো ধরা পড়েছে সেই বোমার মামলায়! কিন্তু পুলিশ আসল লোককে খুঁজে বার করতে পারেনি হে। আসল লোকটা—যে আসলে বোমাটা ফেলেছিল, যে আসলে বোমাটা তৈরি করেছিল, তার আজ পর্যন্ত খোঁজও পায়নি—এখনও তার নামে হুলিয়া ঝুলছে—
—কে? আসল লোকটা কে?
মঙ্গলবাবু বলতেন, আর আমার আসল নামও মঙ্গল সরকার নয়—আমার আসল নামটা কুন্তিও জানে না।
অটলদা অবাক হয়ে শুনছিল।
বললে, তা'হলে আপনার আসল নামটা কী?
মঙ্গলবাবু বললেন, ব্রজেন।
অটলদার সামনে বুঝি বাজ পড়লো! কিন্তু বাজ পড়লেও বুঝি অটলদা এত চমকাতো না। বললে, আপনিই ব্রজেন?
—হ্যাঁ!
—আপনার নামেই পুলিশ দশ হাজার টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছিল?
—হ্যাঁ, এখনও ব্রজেনকে কেউ ধরিয়ে দিতে পারেনি। কেউ তার খোঁজও পায়নি। কেউ জানেই না ব্রজেন কোথায় কেমন অবস্থায় আছে, বেঁচে আছে কি-না! সবাই জানে ব্রজেন ইণ্ডিয়া থেকে পালিয়ে জার্মানী, না-হয় রাশিয়া, না-হয় আমেরিকা কিংবা টোকিওতে পালিয়ে গেছে রাসবিহারী বসুর মত। এক তুমিই প্রথম জানলে—
অটলদা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো মঙ্গলবাবুর দিকে।
—আশা করি, তুমিও আমাকে আগেকার মতই মঙ্গলবাবু ব'লে জানবে। একজন অসুস্থ মধ্যবিত্ত কেরানী বলেই মনে করো, স্বাস্থ্যের জন্যে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কায়ক্লেশে দিন কাটাচ্ছি। হয়তো এখান থেকে পালিয়ে বাইরে চলে গেলেই ভালো হতো, হয়তো তাতেই আরো বেশী কাজ হতো, তাতে হয়তো আমার স্বাস্থ্যও এত খারাপ হতো না—
— সত্যি, আপনি বাইরে গেলেন না কেন? সে-ই তো ভালো হতো।
মঙ্গলবাবু বললেন, বাইরে গেলেই যে ভালো হতো তা আমিও জানতাম। কিন্তু তার চেয়েও যে একটা বড় কাজের ভার আমার ওপর পড়লো।
—কী কাজ?
মঙ্গলবাবু বললেন, ওই যে, ও-ঘরে যে রয়েছে! কুন্তি! ওর জন্যেই আমাকে এখানে থাকতে হলো।

—আপনার মেয়ের জন্যে ?
মঙ্গলবাবু ধীরগলায় আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, ওকে আমার মেয়ে বলেই সবাই জানে। কুন্তিও জানে আমি ওর বাবা!
—তা'হলে আপনি ওর বাবা নন ?
—না!

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের সেই বাংলাদেশ। বিপ্লববাদ তখন আস্তে আস্তে মাথা তুলে জাগছে, জাগাচ্ছে। একদিন আয়ার্ল্যাণ্ডও এমনি ক'রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। পৃথিবীর যেখানেই অত্যাচার হয়েছে জনসাধারণের ওপর, সেখানেই সন্ত্রাসবাদ জন্ম নিয়েছে। আর এই সন্ত্রাসবাদের পতাকা যারা প্রথমে উচ্চে তুলে ধরেছে তারা চিরকালই মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকই বরাবর এগিয়ে এসেছে তাদের অনুযোগ অভিযোগ সামনে খাড়া ক'রে। সমাজের মধ্যে তারাই সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশ। মঙ্গলবাবু সেই সম্প্রদায়ের লোক। তিনি যেমন ক'রে দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন, অনুভব করেছিলেন সে-যুগের যন্ত্রণাকে, এমন ক'রে অটলদারাও অনুভব করেনি। অটলদাকে তিনি সে কথাই বুঝিয়ে দিতেন।
১৯০২ সালে বুয়োর যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। আর এক যুদ্ধের তোড়-জোড় চলছে তখন রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের। ঠিক সেই সময়েই গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হলো। এর পেছনে যে-মহিলার দান একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তিনি ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা।
অটলদা এই প্রথম একজন বিপ্লবীর মুখ থেকে সেই সব দিনের ইতিহাস শুনলো। এতদিন বইতে প'ড়ে এসেছিল। এবার চাক্ষুষ প্রমাণ মিললো!
—আপনারা ভয় পাননি কখনও ?
—কীসের ভয় ? কাকে ভয় ? কেন ভয় করবো ? ভয়টাই তো মৃত্যু! আমার বন্ধু ছিল সত্যেন। সত্যেনের নাম শুনেছো ?
অটলদা বললে, শুনেছি।
এই সত্যেন ছিল ক্ষুদিরামের গুরু। আমরা দু'জনে মেদিনীপুরের মিঞা-বাজারে কুস্তির আড্ডায় কুস্তি করতাম। একসঙ্গে দু'জনেই আগুনের সামনে দীক্ষা নিয়েছিলাম। আমার আর তার পথ ছিল এক। সে যখন ধরা পড়লো, আমি পালিয়ে গেলাম! প্রাণের ভয়ে নয়। মনে হয়েছিল, সত্যেন যে-কাজ শেষ করতে পারেনি, তা আমি শেষ করবো। কিন্তু আমাকে হারিয়ে দিয়ে সত্যেনই জিতে গেল ভাই, সে-ইতিহাস তো এখন সবাই জানে! তুমিও নিশ্চয় জানো ?
—জানি!
অটলদা সে ইতিহাস জানতো। প্রতিদিন সব কাজ সেরে অটলদা একবার ক'রে আসতো। সে যুগের বিপ্লবীদের গল্প শুনতে শুনতে এক-একদিন অনেক রাত হয়ে যেত অটলদার। রাত্রিতে এক-একদিন কুন্তিদের বাড়িতেই খেয়ে নিতো।

কুন্তি তখন ক্লাব ছেড়ে দিয়েছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেছে। লাঠি-খেলা আর তাকে মানায় না। মঙ্গলবাবুর তাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আপত্তি ছিল সমাজের। তখনকার দিনে অতবড় মেয়ে ক্লাবে যাওয়া দূরে থাক্, রাস্তাতেও বেরোতো না।

গল্প শুনতে শুনতে অটলদা বলতো, তারপর?

মঙ্গলবাবু বলতেন, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, কালকে শুনো।

মঙ্গলবাবুর বাড়িতে যাওয়া শেষকালে যেন একটা নেশা হয়ে গেল অটলদার। কোনও ক্লাবের ছেলেরাই আর তাকে পায় না তেমন ক'রে। সবাই জানে অটলদা ব্যস্ত। বাড়ির লোকও দেখতে পায় না তাকে।

আশুবাবু জিজ্ঞেস করতেন কোথায় ছিলে কাল অত রাত পর্যন্ত?

শুধু একটা জবাব দেয় অটলদা। বলে, একটা কাজ ছিল।

কী কাজ, কেমন কাজ, কোথাকার কাজ, নিজের না পরের কাজ, তাও বলে না অটলদা। সে যা ভালো বোঝে, তাই-ই করে। বরাবরই অটলদা কম কথার মানুষ। কখনও ছোটবেলা থেকেই তাকে লেখাপড়ার কথা বলতে হয়নি। মাষ্টার রাখতেও হয়নি তার জন্যে। সে নিজেই লেখাপড়া করেছে। নিজের চেষ্টাতেই ফার্ষ্ট হয়েছে। নিজের ভালো-মন্দ সে নিজেই ভালো ক'রে বোঝে। সুতরাং ছেলেকে কিছু বলতেন না আশুবাবু। কিন্তু মনে-মনে ঠিক করলেন, ছেলের বিয়ে দিলে বোধহয় ছেলে বাড়িতে আসবে সকাল-সকাল।

বন্ধু-বান্ধবরাও সেই পরামর্শ দিলেন।

বললেন, আপনার স্ত্রীরও তো বয়স হচ্ছে, তাঁরও তো একটা কথা বলবার লোক হবে। আপনার মেয়ে থাকলে তবু আলাদা কথা ছিল।

তখন থেকেই তিনি সম্বন্ধ খুঁজতে লাগলেন।

শেষকালে অনেক খোঁজের পর এই সম্বন্ধটা পেলেন। এই আলিপুরেই সম্বন্ধটা। ইন্দুলেখা দেবী। ইন্দুলেখা দেবীকে একদিন চুপি-চুপি দেখেও এলেন।

বন্ধুরা বললেন, ভালো করেছেন, ওখানেই বিয়ে দিন। অত বড়লোক বেয়াই পাবেন, আপনার ছেলের একটা বল-ভরসা তো থাকা দরকার! অত বড়লোক আর তাঁর একমাত্র মেয়ে—এ-কি কম কথা?

অটলদা তখন যেন আর-এক জগতে বাস করছে। তার আহার নেই, নিদ্রা নেই। সে আবার এক নতুন প্রেরণা পেয়েছে। সংসার তো সবাই করে। চাকরিও তো সবাই করে। জঙ্গলের একটা জানোয়ারও পেট চালাবার উপায়টা জানে। তাহ'লে এত লেখাপড়া শিখে অটলদাও কী তাই করবে? তাহ'লে অটলদার সঙ্গে অন্য লোকের তফাৎটা কোথায় রইলো?

সে মঙ্গলবাবুর কাছেই শোনা গল্প।

মেদিনীপুরের মিঞা-বাজারের একটা পোড়ো-বাড়িতে ছিল আমাদের গুপ্ত-সমিতি। কালীমূর্তি ছিল ভেতরে। চাকর-বাকর কেউ ছিল না। আমরা নিজেরাই রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া করতাম। সামনের ঘরে একটা তাঁত বসানো হয়েছিল। তাতে আধখানা কাপড় তৈরী অবস্থায় থাকতো সব সময়ে। সেই তাঁতশালার ভেতরে আমরা সবাই একে-একে জড়ো হতাম। আমি থাকতাম, ক্ষুদিরাম থাকতো, শচীন

থাকতো, নিরাপদ রায় থাকতো। আমরা তখন আর মানুষ নই—আমরা তখন এক-একটা আগুনের ফুলকি।

সে-সব দিনের কথা এখনকার ছেলেরা কেউ জানে না। এখন তো সবাই গা এলিয়ে দিয়েছে। টেগার্ট সাহেবকে দেখে এখন সবাই ভয়ে কাঁপে। এখন পুলিশকে দেখে মানুষ ঘরের মধ্যে লুকোয়। কী ক'রে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হবে, তাই কেবল ভাবে। তখন আমাদের একমাত্র চিন্তা ছিল অন্য। সত্যেনের দাদার একটা দো'নলা বন্দুক ছিল। সেইটে নিয়ে সে শহরের বাইরে গিয়ে আমাদের বন্দুক ছোঁড়া শেখাতো।

ক'দিন থেকেই সত্যেন সন্দেহ করছিল। তাকে যেন কারা অনুসরণ করে মাঝে-মাঝে। একদিন সত্যেন আমাকে বললে, আমাকে যদি পুলিশ ধরে, তো তোকে একটা কাজ করতে হবে ব্রজেন—

—কী কাজ বল ?

সত্যেন বললে, সংসারে কারুর ওপর আমার কোনও দায়-দায়িত্ব নেই, আমি মরলে কারো কোনো লোকসান হবে না—একজন ছাড়া।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে ? তোর দাদা ? জ্ঞাননাথবাবু ?

সত্যেন বললে, না, দাদাকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি, দাদাও আমাকে খুবই ভালো-বাসেন, কিন্তু দাদা নয়।

—তাহ'লে কে ? কার কথা বলছিস্ ?

সত্যেন বললে, সে আমার আপন কেউ নয়, কখনও তুই জানতে চাস্‌নি তার সম্বন্ধে—কিন্তু তারও আপন বলতে কেউ নেই। আমিই বলতে গেলে বরাবর তাদের ভরণ-পোষণ ক'রে এসেছি, কিন্তু আমি ধরা পড়ে গেলে তাদের কী হবে, তাই শুধু ভাবছি।

বললাম, তার জন্যে ভাবিস্‌নি তুই, আমি সে-ভার নিলাম।

সত্যেন বললে, তাহ'লে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোকে যে, কখনও কাউকে তাদের কথা বলতে পারবি না। কে তারা, তারা আমার কে হয়, তাও বলতে পারবি না।

বললাম, প্রতিজ্ঞা করছি, বলবো না।

সত্যেন আবার বললে, তারপর যখন আবার আমি ফিরবো জেল থেকে, তখন আমিই আবার তাদের ভার নেবো—তখন আর তোকে তাদের ভার নিতে হবে না, তখন বলবো কে সে ! তখন বলবো কেন তোকে তার ভার নিতে বলেছিলাম।

তারা যে কে, সত্যেনের সঙ্গে তাদের যে কীসের সম্পর্ক, তাও সত্যেনকে জিজ্ঞেস করিনি। কারণ আমি জানতাম, সত্যেন এ-রকম অনেক অনাথ অসহায়দের সাহায্য ক'রে থাকে। যেদিন মেদিনীপুরে পুলিশ এসে সত্যেনকে ধ'রে নিয়ে গেল, মেদিনীপুরসুদ্ধু লোক অবাক হয়ে গেল। কেন যে সত্যেনকে তারা ধ'রে নিয়ে গেল, তা আর কেউ না-জানুক, আমি জানি। আমি জানলেও কাউকে বলবার উপায় নেই। বলবার প্রয়োজনও নেই। আমাকেও হয়তো ধরতে পারতো। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমি পুলিসের নজর এড়িয়ে গিয়েছি। আমি পরদিনই মেদিনীপুর ছেড়ে চলে এলাম।

কিন্তু আসবার দিন সকালেই একটা ঘটনা ঘটলো। আমি ভোরবেলা বাড়ি থেকে

বেরিয়েছি। তখন রাতই বলতে গেলে। শেষ রাত। কিন্তু আকাশে তখনও চাঁদ রয়েছে। তারাগুলোও জ্বলছে। সকলের দৃষ্টির আড়ালে পালাবো বলেই অমন সময়ে বেরিয়েছিলাম। আশা ছিল কোনও রকমে লোকাল ট্রেনটা ধ'রে একবার কলকাতায় এসে পেঁছিতে পারলেই আর কেউ আমাকে ধরতে-ছুঁতে পারবে না।
হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যেই সামনে কে যেন এসে দাঁড়ালো। সেখানটা বাজার। বাজার তখনও খোলেনি। সেই বাজারের মোড়ে একজন লোক আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। সঙ্গে ছোট্ট একটা মেয়ে। একেবারে ছোট্ট। দু'বছর কি তিন বছর বয়েস।
আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে?
মনে মনে একটু ভয়ও ছিল বৈকি আমার। তবু বাইরে তা না প্রকাশ ক'রে সোজা হয়ে বুক খাড়া ক'রে দাঁড়ালাম।
লোকটা বললে, আপনার সঙ্গে একটা দরকার ছিল।
—কিন্তু আপনি কে?
লোকটা বললে, নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন না। আমি সত্যেনের কাছ থেকে আসছি।
সত্যেন?
আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমি ভুলে গেলাম আমার প্রতিজ্ঞার কথা। একবার সন্দেহ হলো, পুলিশের লোক নাকি? আমাকে এই ব'লে একই মামলায় জড়াতে চায়! সত্যেনকে পুলিশের ধরাটা এত হঠাৎ ঘটেছিল যে, আমি তার কার্য-কারণ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারিনি। তখনকার দিনে পুলিশের ধর-পাকড় এত নিঃশব্দে, এত চুপি-চুপি হতো যে, এক-ঘণ্টা আগেও তার আভাস পাওয়া যেত না! এই বাংলাদেশের বাঙালীরাই ছিল সেদিনকার ইংরেজ-পুলিশের গুপ্তচর। স্বদেশী আন্দোলনেও যেমন পৃথিবীতে বাঙালী ছেলেদের সাহসের তুলনা নেই, তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালী-গুপ্তচরদের চালাকিরও যেন তুলনা নেই।
তাই সত্যেনের নাম শুনেই কেমন একটু চমকে উঠেছিলাম।
লোকটা হয়তো তা জানতে পারলে। বললে, সে জন্যে নয়, ঠিক, সত্যেনবাবু আমাকে আপনার কথাই ব'লে গিয়েছিলেন—আপনাকে একটা ছোট মেয়ের ভার নিতে বলেছিলেন কি?
বললাম, হ্যাঁ, সত্যেন বলেছিল—
—এই সেই মেয়েটি।
আমি চাইলাম মেয়েটির দিকে। আধ-ময়লা ফ্রক-পরা একটা মেয়ে। আমাদের কথাবার্তা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। চুপ ক'রে লোকটার হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনি যদি বাজারের লোকজন জেগে উঠে পড়ে তো আমাদের দেখে ফেলবে। আমাদের চিনে রাখবে। তারপর চরম সর্বনাশ!
—আমি তাহ'লে আসি—
হঠাৎ আমার যেন চমক ভাঙলো। ফিরে দেখি, লোকটা চলে যাচ্ছে মেয়েটাকে রেখে। আর মেয়েটাও তেমনি। সে-ও কাঁদছে না, সে-ও ডাকছে না। আমি

ডাকতে গেলাম, ও মশাই—
কিন্তু গলাটা বুজে এলো আপনা থেকেই।' আমি চুপ ক'রে রইলাম। দেখলাম, লোকটা আস্তে-আস্তে চুপচাপ অন্ধকারের আড়ালে মিলিয়ে গেল। আর আমি মেয়েটার দিকে ফিরে দেখলাম—সে যেন আমার দিকে চেয়ে আমাকে ভালো ক'রে যাচাই ক'রে নিচ্ছে।
কিন্তু তখন আর ও-সব ভাববার সময় নেই। ট্রেন আসবার সময় হয়ে গেছে। ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে। তাতেও কিছু সময় লাগবে।
তাড়াতাড়ি আমি মেয়েটার হাত ধরলাম। হাত ধ'রে স্টেশনের দিকে হন্ হন্ ক'রে চলতে লাগলাম। আর মেয়েটাও নির্বিবাদে আমার সঙ্গে চলতে লাগলো।
তারপর কখন টিকিট কেটেছি, কখন ট্রেনে উঠেছি, কখন কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছি তাকে নিয়ে, তা আর খেয়াল নেই। সত্যেনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সুতরাং আমাকে তার কথা রাখতেই হবে। তার কাছে দেওয়া কথার মূল্য আজীবন শোধ করতে হবে। অন্ততঃ যতদিন না সে জেল থেকে ছাড়া পায় ততদিন।
তা সেইদিন থেকে আমি মঙ্গলময় হয়ে গেলাম। আমি ভুলে গেলাম যে আমার নাম ব্রজেন। আমি নিজের কাছেই নিজে অচেনা হয়ে গেলাম। আমি আমাকেও আর সেইদিন থেকে চিনতে পারলাম না। আমি হয়ে গেলাম কুন্তির বাবা।
যেদিন এই ঘটনাটা বললেন মঙ্গলবাবু, গল্প শুনতে শুনতে সেদিন অনেক রাত হয়েছিল। বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। অটলদা জানালার বাইরে চেয়ে দেখলে।
তারপর জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু কুন্তি? সে জানে এ-সব কথা?
মঙ্গলবাবু বললেন, না, তাকে জানাবার কথা তো দিইনি সত্যেনকে—শুধু কথা দিয়েছিলাম তার ভার নেবো।
—আর আপনার আসল নাম যে ব্রজেন, তা-ও কি কুন্তি জানে?
—না, কিছুই জানে না ও। এক আমি ছাড়া শুধু তুমিই জানলে। দু'একজন যারা জানতো, তাদের সকলের ফাঁসি হয়ে গেছে, কেউ-বা মারা গেছে। এখন একথা শুধু তোমাকেই বললাম।
অটলদা শুনে গম্ভীর হয়ে রইলো। তার যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।
—এত কথা তোমাকে বলতাম না। কিন্তু অনেক দিন ধ'রে তোমাকে দেখে-দেখে আমি তোমাকে চিনে নিয়েছি। তোমার মধ্যে আমি আবার আমার নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। তুমিই পারবে অটল। তুমিই পারবে। অন্য অন্য ছেলেদের দেখি আর হতাশ হয়ে যাই। ছোটবেলায় আমরা ইংরেজ-তাড়ানোর সাধনা আরম্ভ করেছিলাম। তখন তোমাদের মত ছেলে কিছু-কিছু ছিল। কিন্তু আজ তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তোমার মধ্যে সেই পুরানো দিনের 'আমি'কে দেখেছি বলেই আজ তোমাকে বললাম। আজ আমার দিন শেষ হয়ে আসছে।
বুঝতে পারছি আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না। আর চিরকাল কে-ই বা সংসারে বেঁচে থাকে বলো না। আমার নিজেকে দিয়ে আর কিছু হলো না। দেখো না, যে-নামে আমি ছোটবেলা থেকে পরিচিত, সে-নাম আমি ব্যবহার করতে পারি না। যাঁরা আমায় এই পৃথিবীতে এনেছেন, তাঁরাও আমাকে দিয়ে তাঁদের কোনও

উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করতে পারলেন না। আমি হেরে গেলাম ভাই! শুধু সত্যেনকে যে-কথা আমি দিয়েছিলাম, সেই কথাটাই আমি মনে-প্রাণে রাখতে পেরেছি—এইটেই আমার আনন্দ!

—তারপর থেকে কেউ আপনার আসল পরিচয় জানে না?

মঙ্গলবাবু বললেন, না, কেউ না।

—তাহ'লে এতদিন কোন্ পরিচয়ে আপনার দিন কাটলো?

মঙ্গলবাবু বললেন, আমি ক্যালকাটা কর্পোরেশনের ক্লার্ক, এইটেই আমার একমাত্র পরিচয়।

—এখানে চাকরি করার সময়ও কেউ কি জানতে পারেনি আপনি কে?

—না, আমি দেশবন্ধু সি-আর-দাশের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলাম। তিনি আমাকে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমার গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী দেখে হয়তো বুঝেছিলেন আমি দেশ-ভক্ত। তার বেশি কিছু নয়—তার পরেই আমার চাকরি হয়ে গিয়েছিল।

—তারপর?

—তারপর সেই যে একদিন চাকরিতে ঢুকলাম, সেই থেকে আমি ক্লার্কই রয়ে গেলাম, আর কিছু হতে চাইলাম না, আর কিছু হতে পারলামও না। হলে অন্যায় হতো। সত্যেন আমাকে যে-ভার দিয়ে গিয়েছিল, তার ভার বইতে পারতাম না। তাকে কে দেখবে?

—কেন?

মঙ্গলবাবু বলতে লাগলেন, কুন্তি যে আমার মেয়ে নয়, এ-কথা জানলে কুন্তির ক্ষতি হবে, আর আমারও কথার খেলাপ করা হবে। ও আমার মেয়ে এইটেই সবাই জানুক। তাতে যদি কুন্তির ভালো হয়, তাই-ই আমি চাই। তা-ই আমি চেয়েছিলাম। আমার নিজের ভালোর চেয়ে সত্যেনকে দেওয়া কথার দাম অনেক বেশি, কুন্তির স্বার্থটা অনেক বেশি। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আমরা যে কী দুর্যোগের মধ্যে দিন কাটিয়েছি। শুনে না থাকো, আমার কাছে শুনে নাও। 'বন্দেমাতরম' কথাটা উচ্চারণ করাও ছিল তখন পাপ। সেই পাপের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হতো বলেই আমরা অত কঠোর হয়েছিলাম। আমরা ব্রহ্মচারীর মত জীবন কাটাতাম। ভাবতাম, আমরা যদি কষ্টও করে যাই তো আমাদের উত্তরাধিকারীরা তো আরামে থাকবে। তারা তো স্বাধীন বাংলার বুকে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। তাহ'লেই হলো। আমার নিজের সুখের চেয়ে আমাদের চরিত্রের সংশোধনের দিকেই বেশি মন দিতাম।

তা এক-এক সময়ে যে আমার কুন্তির সম্বন্ধে ভাবনা হতো না তা নয়। কে কুন্তি? কে তার বাবা? কে তার মা? যে ভদ্রলোক আমার হাতে কুন্তিকে তুলে দিয়ে গিয়েছিল তিনিই বা কে? অনেক কথা ভাবতাম। কিন্তু ভেবে-ভেবেও কিছু বার করতে পারতাম না। তবে আমি এ-কথা ভালো করেই জানতাম, সত্যেন কোনও অন্যায়ই করতে পারে না। ভগবানেরও যদি কোনও পাপ থাকে, তো তা থাকতেও পারে, কিন্তু সত্যেনের নেই। সত্যেন হয়তো কারো কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। সত্যেন হয়তো কারো কাছে কথা দিয়েছিল, তার অনাথ মেয়েটার ভার

নেবে। সত্যেন আমাকেই সবচেয়ে বিশ্বাস করতো ব'লেই আমারই হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে হয়তো হাসতে-হাসতে ফাঁসির দড়ি পরেছিল গলায়। আমার সঙ্গে আর তার জীবনে দেখা হয়নি বটে, কিন্তু সে যেখানেই থাকুক, এইটুকু ভেবেই আমি সুখ পাই যে, আমি তার কথা রেখেছি—রাখতে পেরেছি। এ ভার আমি চিরকালই হয়তো বয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু পরমায়ুর তো শেষ আছে। আজ মাঝে-মাঝে সেই শেষ আহ্বান শুনতে পাই। মনে হয়, আর তো বেশি দিন নেই আমার। আমার অবর্তমানে আমি কুন্তির ভার কাকে দিয়ে যাবো ?

অটলদা হঠাৎ বললে, আমি যদি ভার নিই, আপনার আপত্তি আছে ?

—আপত্তি থাকবে আমার ?

ব'লে কেমন একটা বিষাদের হাসি হেসে উঠলেন মঙ্গলবাবু।

বললেন, আমার ভার আমি তোমাকে দিয়ে নিশ্চিত হবো, এর চেয়ে আনন্দের আর কী থাকতে পারে আমার কাছে। আমি তো মুক্ত হলাম, আমি তো নিশ্চিন্ত হলাম। আমি তো হাতে স্বর্গ পেলাম অটল। তুমি অনেকদিনের দুশ্চিন্তা থেকে তো আমাকে মুক্তি দিলে। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম।

তখন অটলদা জানতেও পারলে না। অটলদা কল্পনাও করতে পারলে না, কী নিদারুণ ভার সে নিলে। কী নিদারুণ বোঝা চিরজীবনের মত মাথায় চাপলো তার।

আর তারপরই একদিন মঙ্গলবাবুর অসুখ হলো।

সেইটেই তার শেষ অসুস্থতা। সেই অসুস্থতার মধ্যেই বাক্‌দান-সম্প্রদান-বিয়ে-পরিণয় সমস্ত কিছুর সমাধান হয়ে গেল। ভবানীপুরের ছোট্ট একখানা ভাড়াটে বাড়ির উঠোনে অসুস্থ মঙ্গলবাবুর চোখের সামনেই অটলদা আর কুন্তি দেবীর জীবনের চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে এলো।

কিন্তু অটলদা ত্যাগে বিশ্বাসী, শক্তিতে বিশ্বাসী, ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাসী। অটলদার কাছে বাবা-মার চেয়ে দেশ বড়, মাতৃভূমি বড়। আর কুন্তিও তখন অটলদার মন্ত্রশিষ্য। অটলদাই তার আদর্শ পুরুষ। তার হাতেই নিজেকে সঁপে দিয়ে ধন্য মনে করলো।

মঙ্গলবাবু শেষ আশীর্বাদ করলেন।

বললেন, তোমরা সুখী হও, তোমরা দু'জনে মিলে দেশের কল্যাণ করো, দেশকে মুক্ত করো—আমি আর কিছু চাই না।

ছোট্ট অনুষ্ঠান। তার চেয়েও ছোট উৎসব। তিনটি প্রাণী জানলো সেদিনকার ঘটনা। কোথাকার এক অজ্ঞাত-অখ্যাত একটি মেয়ে অটলদার জীবনে পাকে-পাকে সাপের মত জড়িয়ে গেল। কুন্তি ঘোমটা-মাথায় অটলদার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। দু'টো জীবন এক হয়ে সেদিন একাকার হয়ে গেল।

মঙ্গলবাবু মারা যাবার আগে ব'লে গেলেন—আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি, সে শুধু তোমার-আমার মধ্যেই গোপন থাকুক, আমি চাই আর কেউ যেন তা জানতে না পারে।

অটলদা কথা দিলে—তাই-ই হবে।

এ গল্প যদি এখানেই প্রথম আর এখানেই শেষ হতো তাহ'লে আর অটলদার জীবন

নিয়ে উপন্যাস্ লেখবার প্রয়োজন হতো না।

অধীর বোস্ও তাই বললে।

বললে, লোকে বিয়ে করে এবং সেটা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে। সেইজন্যেই দশজনকে সাক্ষী রেখে তাদের খাওয়ানো রীতিটা হয়েছে। এ-নিয়মটা আজ মনে হচ্ছে ভালো। আগে মনে করতাম ওটা অপব্যয়—ভূত-ভোজন। কিন্তু তা নয়।

সত্যিই, যখন আমরা অটলদা বলতে অজ্ঞান, অটলদার কথাকে বেদবাক্য ব'লে মেনে চলছি, তখন কিন্তু অটলদা আমাদের সব আস্থা ভেতরে-ভেতরে টলিয়ে দিয়েছে। আমরা জানতাম অটলদার অনেক কাজ। অটলদা বৃহৎ দেশকে গ'ড়ে তোলবার জন্যে আরো বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমরা দূরে থেকে তাঁকে প্রণাম করেছি, শ্রদ্ধা জানিয়েছি। অকারণে বিরক্ত ক'রে তাকে যোগভ্রষ্ট হতে দিইনি।

এমনি করেই হয়তো চলতো। এমনি করেই অটলদা আর কুন্তি দেবীর জীবন নতুন ঐশ্বর্যে মহীয়ান হয়ে উঠতো হয়তো। কিন্তু তা আর হলো না।

কেন হলো না, তা বলবার কিংবা ব্যাখ্যা করবার দায় আমার নয়। মানুষের জীবন কি অঙ্ক ক'ষে মেলানোর জিনিস ? মানুষের জীবন কি রুল-অফ্-থ্রি। দুই-এ আর দুই-এ চার হয় গণিত-শাস্ত্রে। গণিত-শাস্ত্র দিয়ে কি জীবন-বিচার চলে ?

নইলে ফরিদপুরে লাটসাহেবের ট্রেনের উপর বোমা মারবার জন্যে যে-ব্রজেনকে সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই ব্রজেনই মঙ্গলময় হয়ে যে কলকাতা শহরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, তাই বা কে জানতো এক অটলদা ছাড়া ? অটলদাই কি জানতো মানুষের সবচেয়ে বড় আদর্শের অধিকারী হয়েও সে এমন ক'রে ভেসে যাবে শেষ পর্যন্ত ? তুমি, আমি এবং আর পাঁচজন যেমনভাবে বেঁচে আছি, ভাবছি, বড় হচ্ছি, সেইভাবে অটলদাও তো বড় হতে পারতো! বড় হয়ে সরকারী অফিসে বড় একটা চাকরি নিয়ে সহজ ভাবেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো! আর পাঁচজন যেমনভাবে সংসারে আপোষ ক'রে বেঁচে থাকে, তেমনি ক'রে আপোষ করলেই আমরা তাঁর বাহোবা দিতাম, আমরা তাঁর প্রশংসা করতাম, কিম্বা মৃত্যুর পরে চাঁদা তুলে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভও করতে পারতাম!

কিম্বা হয়তো জীবনের সঙ্গে আপোষ করতে গিয়েই এমন হলো অটলদা'র। কে জানে।

যদি কুন্তি দেবীকে বিয়েই করেছিল অটলদা, তাহ'লে সে-কথা প্রকাশই-বা করলে না কেন ?

রোজ-রোজ বাড়ি ফিরতে রাত হয় দেখে একদিন আশুবাবু ছেলেকে জেরা করলেন। বললেন, এত রাত হয় কেন তোমার ?

অটলদা বরাবর সত্য-কথার মানুষ। বললে, আমার কাজ থাকে।

কিন্তু বাড়ির কাজও তো থাকতে পারে! আমি বুড়ো বয়েসে কি সেইসব কাজ করতে পারি ? আমার তো বয়েস হচ্ছে।

এ-কথার কোনও জবাব থাকে না দেবার মত!

এর পরেই আশুবাবু আর চুপ ক'রে থাকা যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে করলেন না। বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন। তাঁরও বয়েস হচ্ছে। এরই মধ্যে তিনি বেঁচে থাকতে-থাকতে ছেলের একটা ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া তাঁর কর্তব্য!

সেদিনও যথারীতি অটলদা বেরোচ্ছিল বাড়ি থেকে। আশুবাবু বললেন, এখন বেরিয়ে যেয়ো না, তোমাকে একটু থাকতে হবে বাড়িতে।

—কেন ?

আশুবাবু ভাবলেন সব কথা খুলে বলা উচিত নয় ছেলেকে। তাহ'লে আপত্তি করতে পারে। কিছু না বলেই তিনি তাঁর নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগলেন। কিন্তু অটলদার কেমন যেন সন্দেহ হলো। সে ছট্-ফট্ করতে লাগলো। মনে হলো, কোথায় যেন তার বিরুদ্ধে কে ষড়যন্ত্র করছে। সমস্ত সকালটা যেন বড় অস্বস্তিতে কাটতে লাগলো। অটলদা সোজা মা'র কাছে গেল।

—মা, আজকে বাড়িতে এসব কিসের ব্যবস্থা হচ্ছে ? কী হবে বাড়িতে ?

মা বললে,-তোকে দেখতে আসছে।

—আমাকে দেখতে ? যেন আকাশ থেকে পড়লো অটলদা।

তারপর বললে, দেখতে আসবে মানে ? আমি কি বাঘ না ভালুক যে আমাকে দেখতে আসবে।

—হ্যাঁ, পাকা-দেখা হবে আজকে তোর।

মাথায় যেন বজ্রঘাত হলো অটলদার। এতদিন বাড়িতে আসেনি অটলদা। এতদিন শুধু কয়েক-ঘন্টার জন্যে রাত কাটাতে বাড়িতে এসেছে। আর তারই মধ্যে কখন এত ষড়যন্ত্র হয়েছে তার বিরুদ্ধে সে কিছুই টের পায়নি।

অটলদার অন্তরাত্মা হঠাৎ এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে উঠলো। বললে, আমি থাকবো না বাড়িতে, আমি কিছুতেই থাকবো না মা। আমি এখনি চলে যাচ্ছি—

ব'লে সদর দরজার দিকে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দরজার সামনে যেতেই পাত্রীপক্ষের গাড়ি এসে হাজির। গাড়ি থেকে নামছিল পাত্রীর বাবা। পুরোহিত। আর দু'চারজন সাজা-গোজা ভদ্রলোক। একেবারে মুখোমুখি। আশুবাবুও বেরিয়ে এলেন।

নমস্কার, প্রণাম, অভ্যর্থনা সুরু হয়ে গেল। সবাই এসে বসলেন বাইরের ঘরে। মধ্যবিত্তের সংসার। মধ্যবিত্তেরই বৈঠকখানা। সে-সম্বন্ধে কারো কোনও অভিযোগ বা লজ্জা কিছুই ছিল না।

এ জানা কথা। সব জেনেই এখানে পাত্রীকে দিচ্ছেন তাঁরা। ছেলেটি মেধাবী, সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান। ছেলে সম্বন্ধে তাঁরা অনেক খোঁজখবর নিয়েছেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছেন, এ ছেলে রত্ন। এ-ছেলে একদিন জীবনে সাফল্যের উচ্চ-শিখরে উঠবে। পাড়ায়-বেপাড়ায় সবাই একবাক্যে এই কথাই বলেছে। সবাই বলেছে, এমন পাত্র লাখেও একটা মেলা ভার। সুতরাং ছেলের বাবার আর্থিক অবস্থা দেখে তাঁদেরও অভিযোগ করবার কিছু নেই, আশুবাবুরও লজ্জা পাবার কিছু নেই।

আর আশ্চর্য। আশ্চর্য অটলদা। আশ্চর্য অটলদার ব্যবহার।

অটলদা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করলে। সহ্য করলে এইটুকু ভেবে যে, এর পরেই তার মুক্তির উপায় আছে। এই-ই তার চরম দণ্ডাজ্ঞা নয়। বাবার মুখ চেয়ে সে এটুকু অত্যাচার অনায়াসেই সহ্য করতে

পারে। এর পরে না হয় অটলদা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে কলকাতা থেকে। তারপর অন্যায় যদি কিছু করেই থাকে সে, তো সে-অন্যায়ের জন্যে জবাবদিহি চাইতে যাচ্ছে না কেউ তার কাছে। জবাবদিহি করবার জন্যে সে আর পরিচিত মানুষের সমাজে ফিরেও আসছে না এ-জীবনে। তখন কোথায় কে পাবে তাকে ?

আর ব্রজেনবাবুর জীবনও তো সে জানে! সেই রোমাঞ্চকর জীবনীও তো মঙ্গলবাবু তাকে ব'লে গেছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যে-মিথ্যাচার, তা মিথ্যাচার নয়। জীবনের চেয়ে দেশ অনেক বড়। পারিবারিক কর্তব্যের চেয়ে বড় দেশ। এমন কি বাবার চেয়েও বড় বিবেক!

পাত্রীপক্ষ খুশী হয়ে চলে গেলেন! অটলদাও বেরলো বাড়ি থেকে। তখন কুন্তির নতুন বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হওয়া মানে আমূল পরিবর্তন হওয়া। এ-মানুষটা যতদিন তার কাছে গুরু ছিল, যতদিন আদর্শ-চরিত্র ছিল, ততদিন অন্যদৃষ্টি দিয়ে দেখেছে অটলদাকে। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর অটলদার আর-এক রূপ সে দেখতে পেলে। এতদিন বাবাই ছিল তার কাছে একমাত্র পুরুষ। কিন্তু সব পুরুষ মানুষই যে একরকম হয় না, তার প্রমাণ সে প্রথমবার পেলে অটলদাকে দেখে। অটলদা যেন সারা দিন কী ভাবে!

কুন্তি জিজ্ঞেস করতো—তুমি এত কী ভাবো সারাক্ষণ ?

—কই কিছু তো ভাবি না!

ব'লে কুন্তির প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতো অটলদা। অটলদার মনে হতো সে যেন ধরা প'ড়ে যাবে। শুধু কুন্তির কাছে ধরা পড়ার প্রশ্ন নয়। আশে-পাশে, পাড়ায়-বেপাড়ায় সকলের কাছে ধরা পড়ার প্রশ্ন। ছোটবেলা থেকে অটলদা সকলের কাছে শুধু ভালোবাসাই পেয়ে এসেছে, শুধু শ্রদ্ধাই পেয়ে এসেছে। সকলে একবাক্যে শুধু প্রশংসাই ক'রে এসেছে তাকে। নিন্দে, কুৎসা, অপবাদ পাবার দুর্ভোগ কখনও বইতে হয়নি অটলদাকে। তার সুনামটা ছিল সস্তা, প্রশংসাটা ছিল প্রাপ্য! এই সুনামের জন্যে অটলদাকে কোনও মূল্য দিতে হয়নি কোনোও দিন। যা এসেছে তা সহজেই এসেছে। সেই সহজ পাওয়ার পথে হঠাৎ যেন কেউ প্রথম বাধা দিলে। তারপর থেকেই মনে হতো সবাই যেন সন্দেহ করছে তাকে। সবাই যেন জানতে পারলেই তাকে শ্রদ্ধার আসন থেকে নামিয়ে একেবারে মাটিতে ফেলে দেবে। যেন সেই ভয়েই অটলদা আড়ালে-আড়ালে লুকিয়ে বেড়াতে ভালোবাসতো।

রাস্তায় পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই কেমন এড়িয়ে যেতে চাইতো তাদের। কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করতো, কি হে, খবর কী তোমার ? কী করছো আজকাল ?

অটলদা বলতো, এখন কাজ আছে ভাই, চলি।

—তা কী এত কাজ তোমার, শুনিই না।

অটলদা বলতো, কাজের কি শেষ আছে ?

ব'লে অন্যদিকে স'রে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতো।

তা বটে! সত্যিই তো! অটলদার কী একটা কাজ! আমাদের মতন তো সাধারণ মানুষ নয় অটলদা, যে সারাদিন তাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে। সারাদিন রাস্তায়

মিটিং-এ আড্ডায় দেখা যাবে। অটলদা যে জিনিয়াস। অটলদা যে প্রতিভা! অটলদা যে অসাধারণ!
যত লোকের কাছে সম্মান পেতো, অটলদা ততোই যেন ভয়ে আঁতকে উঠতো। সবাই যদি জেনে যায়। সবাই যদি ধ'রে ফেলে তাকে! সকলের চোখের আড়ালে থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করবার যে সহজ পন্থাটা আছে, অটলদা সেই সহজ পন্থাটাই বেছে নিলে তখন থেকে। ভক্তদের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সম্মান আদায় করবার ক্ষমতাটুকুও যেন তার লোপ পেয়ে গেল।
কুন্তি বলতো, সারাদিন কোথায় ছিলে আজ?
অটলদা বলতো, কাজে ব্যস্ত ছিলাম।
—কী কাজ?
অটলদা বলতো, কাজ কি একটা? আজ আবার বরানগরে যেতে হয়েছিল।
—কিছু টাকা আনবে বলেছিলে যে? টাকার কী হলো? বাড়ি-ভাড়া বাকি প'ড়ে রয়েছে যে দু'মাস।
অথচ সমস্ত মিথ্যে কথা! সমস্ত দিন হয়তো অটলদা ময়দানের নিরিবিলি মাঠে ঘাসের ওপর ব'সে কাটিয়েছে। কিম্বা একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে ব'সে চিন্তায় স্বর্গ-মর্ত-পাতাল তোলপাড় ক'রে বেড়িয়েছে।
মনে হতো—কী হলো তার? সমস্তই কি ফাঁকি? তার যদি টাকাই নেই, তাহ'লে কেন সে ব্রজেনবাবুর কথা রাখতে গেল? সেও কি অন্যের চোখে নিজেকে মহৎ-সৎ-সাধু প্রমাণ করবার জন্যে!
এক-একবার মনে হতো চাকরির একটা চেষ্টা করলে হয়। চাকরির চেষ্টা করলে লোকে তাকে লুফে নেবে! কিন্তু সেখানেও তো ওই একই সমস্যা! সে যে তাহ'লে সকলের সমান হয়ে যাবে। সকলের সমান হয়ে সকলের সঙ্গে একস্তরে নেমে দাঁড়ালে কেউ যদি আগেকার মত ভক্তি না করে? শ্রদ্ধা না করে? যদি বলে অটলদা লেখাপড়া শিখে যা হয়েছে, আমরা লেখাপড়া না-শিখেও তাই-ই হয়েছি। অটলদা আর আমরা একই।
সমস্ত দিন ময়দানে-ময়দানে ঘুরে অস্থির হয়ে উঠতো অটলদা। এই কলকাতা, এই এই বাংলাদেশ, এই ইণ্ডিয়া, সমস্ত মানুষের কাছে অটলদা যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে। তাকে যেন আর কেউ আগেকার মত ঈর্ষা করে না। এ-ও এক যন্ত্রণা, এ-ও এক শাস্তি, এ-ও এক নিদারুণ অভিশাপ।
রাত্রে কিছুক্ষণের জন্যে কুন্তিদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতো।
কুন্তি সেই একই প্রশ্ন করতো—চাকরি পেলে তুমি?
চাকরির নাম শুনলেই রাগ হয়ে যেতো অটলদার।
—চাকরি? আমি করবো চাকরি? চাকরি করলে তো আমি অনেক আগেই তা করতে পারতাম! তুমি কি মনে করো আমি সাধারণ লোকের মত চাকরি করবার জন্যে জন্মেছি?
কুন্তি প্রথম-প্রথম শ্রদ্ধা নিয়েই কথা বলতো। তখনও তার মোহ পুরোপুরি ঘোচেনি। বলতো, কিন্তু চাকরি না করলে চলবে কী ক'রে?
—অটলদা বলতো, আমার সঙ্গে যখন তোমার জীবন জড়িয়ে গিয়েছে, তখন আমার

যেমনভাবে চলবে, তোমারও তেমনিভাবেই চলা উচিৎ।
—কিন্তু আমার না চলুক, তোমারও তো চলছে না।
অটলদা বলতো, আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।
—কিন্তু আমারই বা কী ক'রে চলবে, সেটাও তো ভাবা উচিত। আর তাই-ই যদি না ভাববে, তাহ'লে আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন?
এ-কথার উত্তর দিতে গিয়ে অটলদার মত অটল ধৈর্যের লোকেরও কেমন যেন মনটা টলে উঠতো সামান্য। কিন্তু তখুনি আবার সামলে নিতো। এক-একবার মনে হতো, সমস্তই প্রকাশ ক'রে দেবে। কে কুন্তি, কী তার পরিচয়, কেন তাকে বিয়ে করেছে, সমস্ত কথাই প্রকাশ ক'রে দিয়ে চিরকালের মত সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে কোথাও চলে যাবে।
কিন্তু তা শুধু সাময়িক। আবার নিজেকে সামলে নেয় অটলদা। আবার চুপ ক'রে যায়। আবার সমস্ত বিরোধ মাথা পেতে নিয়ে নিজের বাড়িতে বাদাম-তলায় চলে আসে। আবার কিছুক্ষণের জন্যে প্রশান্ত দৃষ্টিতে কুন্তিকে ক্ষমা করে। নিজের স্বরূপ খুঁজে পায় নিজের মধ্যেই। তখন আবার মনে পড়ে, সে সাধারণ মানুষ হয়ে সংসারে বাঁচতে আসেনি। সংসারে আর-পাঁচজন মানুষের মত চাল-ডাল-তেলনুনের হিসেব নিয়ে মাথা ঘামানো তার কাজ নয়। সে ক্ষণজন্মা। স্বামী বিবেকানন্দের মত অটলদা নিজেও ঘর-ছাড়া। স্বামী বিবেকানন্দের মত তাকেও সংসারের লোকের আবেদন-নিবেদন গ্রাহ্য করলে চলবে না। তার নিজের আদর্শে পেঁছিতে হ'লে এ-সমস্ত বাধা আসবেই। এ-বাধা দূর করার মধ্যেই তার মহত্ত্ব, এ-বাধা অতিক্রম করার মধ্যেই তার গৌরব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?
অধীর বোস বলতে লাগলো, আমরা যখন অটলদাকে মনে-মনে পুজো করেছি, মনে-মনে ভেবেছি অটলদা কত ব্যস্ত, কত ছেলে-মেয়েকে মানুষ করবার সাধনায় বিব্রত, যখন আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছি অটলদা নিজের তপস্যায় মগ্ন, তখন আসলে কিন্তু অটলদা পাগলের মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন অটলদা লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে, তখন গোপনে বিয়ে করার জ্বালা মনের মধ্যে পুষে রেখে তুষের আগুনের মত নিজেকে হত্যা করছে।
কুন্তি বলতো, আমাকে যদি তুমি প্রতিপালন না করবে তাহ'লে আমি কোথায় যাবো?
অটলদা বলতো, কেন? তুমি যেখানে আছো, সেখানেই থাকো।
—আর তুমি?
অটলদা বলতো, তোমাকে বিয়ে করেছি বলে কি তোমার কেনা চাকর হয়ে গেছি? আমার কি নিজের স্বাধীন সত্তা বলে কিছু নেই?
—কে বলছে নেই?...আমি কী তাই বলেছি?

—তোমার জন্যে আমার লেখাপড়া সাধনা-তপস্যা সব যে গোল্লায় গেল! এমন করলে আর কিছুদিনের মধ্যে আমি পাগল হয়ে যাবো।
কুন্তি বলতো, কিন্তু তার আগে যে আমিই পাগল হয়ে গিয়েছি—আমার যে আর মাথার ঠিক নেই—'
অটলদা বলতো, কিন্তু পাগলই যদি হয়েছো তো আর একজনকে মিছিমিছি পাগল ক'রে দিচ্ছো কেন?
—আমার জন্যে তোমার কি একটুও ভাবনা, হয় না? আমি কি তোমার কেউ নই? আমাকে কি তুমি আগুন-সাক্ষী রেখে বিয়ে করোনি? বলো, তুমি তোমার বুকে হাত দিয়ে ব'লে যাও।
অটলদা স্থির হয়ে দাঁড়ালো খানিকক্ষণ। খানিকক্ষণের জন্যে চোখ দু'টো বড়-বড় হয়ে গেল। বোধহয় রাগের ঝোঁকে একটা কিছু করেই ফেলতো সেদিন। কিন্তু সামলে নিলে তখনই।
বললে, তুমি কি আমাকে একটু শান্তিও দিতে পারো না?
—শান্তি?
কুন্তি যেন হেসে উঠলো নিজের মনে। বড় ম্লান সে হাসি।
বললে, শান্তি কি তুমিই আমায় দিয়েছো এক মুহূর্তের জন্যে?
অটলদা বললে, জানো, তোমার জন্যে কতবড় স্বার্থ ত্যাগ করেছি?
—বলো, কী তুমি ত্যাগ করেছো? শুনি তোমার ত্যাগের ফিরিস্তি।
—তার মানে? তোমাকে বিয়ে করার আগে আমার কত শক্তি ছিল, জানো? আমার কত সম্মান ছিল, জানো? আমার কত কাজ ছিল, তা তুমি জানো? সকলে আমাকে কত শ্রদ্ধা করতো তা জানো?
কুন্তি বললে, খুব জানি। একদিন আমিও তো তোমাকে কত সম্মান দিয়েছি—
—কিন্তু সে-সম্মান চলে গেল কেন? কেন আমি আর মাথা উঁচু ক'রে আগেকার মত লোকের সঙ্গে মিশতে পারি না, কথা বলতে পারি না? বলো, কেন পারি না?
কুন্তি বলে, বলবো? সত্যি কথা বলবো?
—হ্যাঁ, বলো!
কুন্তি বললে, আসলে তোমার নিজের মধ্যেই ফাঁকি ছিল। আসলে তোমার মধ্যে কোনও গুণই ছিল না। এক একজামিনে ফার্স্ট হওয়া ছাড়া আর কোনও গুণই ছিল না তোমার মধ্যে। সবাই তোমাকে 'বড়-বড়' ব'লে ব'লে তোমাকে বড় ক'রে দিয়েছিল, সত্যিকারের বড় কিন্তু তুমি ছিলে না। তুমি চাইতে সবাই তোমাকে অসাধারণ ব'লে ভাবুক, সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা করুক, সবাই তোমাকে 'গুরু' ব'লে মানুক—কিন্তু সত্যিকারের গুরু হওয়া কি অত সোজা? তাতে অনেক ত্যাগ করতে হয়—তাতে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়! তুমি কিছু না ত্যাগ করেই সকলের মাথায় উঠতে চেয়েছিলে।
কথাগুলো অটলদার শুনতে ভালো লাগছিল না।
বললে, শেষকালে আমার সম্বন্ধে এই তোমার মত?
কুন্তি বললে, তুমি আমার মত জানতে চেয়েছিলে বলেই তোমাকে বললাম। তোমার অনুমতি নিয়েই তো আমি বলেছি।

—তাহ'লে তাই-ই বেশ। আমাকে যদি শ্রদ্ধা করতে না পারো তো আমাকে ছেড়ে দাও—আমাকে কেন আর যন্ত্রণা দিচ্ছো ?
ব'লে রাগ ক'রে চলে আসছিল অটলদা। হঠাৎ পেছন থেকে অটলদার হাত ধ'রে ফেললে কুন্তি। বললে, কোথায় যাচ্ছো!
—যেখানে আমার খুশি!
—যেখানে খুশি চলে গেলে তো চলবে না। ভুলে যেও না, তুমি আমায় বিয়ে করেছো।
—কিন্তু বিয়ে করেছি ব'লে কি আমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছে বলেও কিছু থাকতে নেই ?
কুন্তি হাতটা আরোও জোরে চেপে ধরে বললে, না নেই।
—তার মানে ?
—তার মানে তুমি ভালো করেই জানো। আমি তোমার সহধর্মিনী। আমাকে বাদ দিয়ে তোমার আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই! থাকলে আইনে আটকাবে।
—তুমি আমাকে আইন দেখাচ্ছো ?
কুন্তি বললে, পুলিশের আইন ছাড়া আরো অনেক আইন আছে সংসারে। ঈশ্বর যদি মানো, তো তারও আইন আছে। এই পৃথিবী যাঁর আইনে চলছে, এই সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র যে-আইনে নড়ছে, সেটাও তো একটা আইন! সে-আইনেও তো আটকাবে ?
অটলদা বললে, আমি সে-আইন মানি না।
—তুমি মানো না বললে আইন তা শুনবে কেন ? আর আমিই বা কেন তা শুনতে যাবো ?
অটলদা আর সহ্য করতে পারলে না। বললে, তুমি শুনবে কি শুনবে না তা নিয়ে আমার মাথা ব্যাথার দায় নেই, আমি চললাম—
ব'লে তাড়াতাড়ি কুন্তির হাতটা এক-ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর—
কিন্তু কুন্তি তার আগেই গায়ের পাঞ্জাবিটা টেনে ধরেছে। টানতেই পাঞ্জাবিটা টান লেগে অনেকখানি ছিঁড়ে গেল। অটলদা থমকে দাঁড়ালো। ছেঁড়া পাঞ্জাবিটার দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর আর কোনও দিকে না চেয়ে সোজা বাইরে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে গেল।
কুন্তি পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে দিয়ে নিজেও যেন একটু বিব্রত বোধ করছিল। কিন্তু যখন তার জ্ঞান হলো, তখন অটলদা আর সেখানে নেই। চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে!
এমন ঘটনা কুন্তি দেবীর বিবাহিত জীবনে এই-ই প্রথম, অটলদার জীবনেও এই-ই প্রথম। চিরকাল মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-সম্মান পেয়ে-পেয়ে অটলদার অহমিকা বোধহয় স্ফীত হয়ে উঠেছিল। মনে হতো, সে কেন ছোট হবে কারো কাছে ? সে কেন অন্য মানুষের সমালোচনার পাত্র হবে। সে তো কোনও অন্যায় করতে পারে না। তার অন্যায় যদি কিছু হয়, তা-ও ন্যায় ব'লে ধ'রে নিতে হবে। অটলদা যে জিনিয়াস। অটলদা যে প্রতিভা। অটলদার অন্যায় প্রতিভার। অন্যায় অটলদার

ভুল জিনিয়াসের ভুল। আসলে তা ভুলই নয়।
তারপর সেই অবধারিত লগ্ন ঘনিয়ে এলো।
তখন নিমন্ত্রণের চিঠি-পত্র ছাপানো, বিলোনো সমস্তই হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে সারারাত অনিদ্রায় কাটলো অটলদার। শেষ মুহূর্তে এই সমস্ত আয়োজনকে পণ্ড করে দিয়ে পালিয়ে যাবে সে? যেখানে কেউ তাকে জানবে না, চিনবে না। যেখানে গেলে তার অতীতটা মুছে ফেলতে পারবে? যেখানে গেলে নতুন ক'রে আবার আরম্ভ করতে পারবে তার জীবনটা?
ভেবে-ভেবে অটলদা পূবের চাঁদটাকে পশ্চিমের আকাশে ঠেলে পাঠিয়ে দিতো! মাঝে-মাঝে আশুবাবু জিজ্ঞেস করতেন, তোমার চেহারাটা দিনকে দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?
অটলদার কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে আশুবাবু কেমন যেন ভয় পেয়ে যেতেন। আর একটা দিন। আর একটা দিন কোনও রকমে কাটাতে পারলেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়!
স্ত্রীকে গিয়ে বললেন, অটলের মুখখানা শুকনো-শুকনো কেন গো?
কাকীমা বললেন, কই, আমি কিছু বুঝতে পারিনি তো?
—না, ও তোমাকে কিছু বলেছে-টলেছে?
—কী আবার বলবে?
আশুবাবু বললেন, ওই যে ক'দিন ধ'রে বিয়ে করবো না বলছিল—
—সে তো সব ছেলেই ব'লে থাকে!
—না, আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, শেষে হয়তো ভদ্রলোকের কাছে আমায় বে-ইজ্জত হতে হবে। বরাবরই তো অটল একটু একগুঁয়ে।
না, সে-সব কোনো ভয়ই টি'কলো না। অটল ক'দিন বাড়ী থেকে বেরোলই না। আশুবাবুও অবাক হয়ে গেলেন। যে-ছেলে দিনরাত বাইরে-বাইরে ঘুরতো সারাদিন, সেই ছেলেই যে এমন ক'রে আবার ঘরে এসে ঘর থেকে নড়তে চাইবে না, তাই-ই বা কে কল্পনা করতে পারতো।
সারাদিন ধ'রে বাজার-হাট হলো! অটলদার বিয়েতে খাটবার লোকের অভাব হবার কথা নয়। আশুবাবু যা-যা করতে বলতেন, আমরা তাই-ই করতাম। আটা-ময়দা-ঘি নানান জিনিস কিনে আনলাম আমরাই। বাড়ি আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি হয়ে গেল। নহবৎ-এর অর্ডার দিলাম। কিন্তু অটলদা সারাদিন নিজের ঘরে চুপ করে বসে রইলো।
আমাদের দেখে আগে কথা বলতো। সেদিন তেমন কোনও কথা বললে না। দেখলাম, অটলদার চেহারাটা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে।
আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তোমার শরীর খারাপ নাকি অটলদা?
অটলদা গম্ভীর গলায় বললে, না—
কী জানি, আমাদের মনে হলো, হয়তো বিয়ের দিন চেহারা ওই রকম শুকিয়েই যায় সকলের। উপোস করতে হয় তো! উপোস ক'রে থাকলে শরীর তো শুকিয়ে যাবেই।
বললাম, তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে অটলদা?

অটলদা বললে, ভালো।
যেন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছিলো না অটলদার। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মুখটা এমন গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?
অটলদা জোর ক'রে হাসতে চেষ্টা করলে। শীতকালে ঠোঁট ফাটলে মুখ দিয়ে যে-রকম হাসি বেরোয়, সেইরকম হাসি। সে অটলদার হাসি নয়। কাঁদবার পরই লোকের মুখে এরকম হাসি দেখেছি। আমরা অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অটলদা শুধু বললে, আমি খুব ভাবনায় পড়েছি—
—কেন? তোমার আবার ভাবনা কী অটলদা?
অটলদা বললে, ভাবনা কি কম? কত কাজ প'ড়ে রয়েছে চারদিকে, অথচ কিছুই করা হচ্ছে না।
আমরা তো তখন ভেতরের ব্যাপার জানতাম না। অটলদার ভেতরে তখন যে ঝড় বয়ে চলছে, তা-তো আমরা জানতাম না—যে, অটলদা লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ফেলেছে। লুকিয়ে-লুকিয়ে কুন্তি দেবীকে না-জানিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। অটলদা ভেবেছিল কুন্তি দেবী হয়তো কিছুই জানতে পারবে না। এখানে এসে চুপি-চুপি বিয়ে ক'রে কোথাও দূরে চলে যাবে। চাকরি নিয়ে অচেনা-অজানা জায়গায় গিয়ে নতুন স্ত্রীকে নিয়ে নতুন জীবন-যাত্রা আরম্ভ করবে।
মানুষের পক্ষেই ভুল করা সম্ভব। দেবতার পক্ষে নয়।
কিন্তু আজ বুঝতে পারছি এ অটলদার ভুল নয়, নির্বুদ্ধিতা। সকলের চোখে বড় হবো, সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধা চিরকাল ধ'রে পেয়ে যাবো, সকলের মাথায় চড়ে ব'সে থাকবো, এ-ধারণাই তো নির্বুদ্ধিতা।
সত্যিই তো, কেন আমরা অটলদাকে অত উঁচুতে তুলে দিয়েছিলাম। আমাদেরই তো দোষ! তাই অটলদাকে বিচার-বিবেচনা করেই মনে হয়, মানুষের পক্ষে আঘাত পাওয়াই বোধহয় ভালো। অনাদর পাওয়াই বোধহয় স্বাস্থ্যকর। ছোটবেলা থেকে পাড়ার ছেলে, বাবা-মা সকলের কাছ থেকে আদর পেয়ে-পেয়েই বোধহয় অটলদা এমন হয়ে গিয়েছিল। সকলের চোখে ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়েই বোধহয় এমন নির্বুদ্ধিতা ক'রে বসলো! নইলে আর কী কারণ থাকতে পারে?
সন্ধ্যেবেলা বরযাত্রী যাবার জন্যে আমরা সবাই তৈরী হয়ে নিয়েছি।
অধীর বোস বললে, সে-সব তো তোরা জানিস্! আশুবাবু যা ভয় করেছিলেন, তার কিছুই হলো না। অটলদা যে অত সহজে সব কাজ করতে রাজি হবে, তা কেউই ভাবতে পারেনি। যে অটলদা বরাবর খদ্দর পরতো, সেই অটলদাই সেদিন গরদের পাঞ্জাবি পরলে। জরি-পাড় ধুতি পরলে। বরের বেশে সেজে-গুজে গাড়ি চড়ে বিয়ে করতে গেল।
আমরা তখনও কেউ কিছু সন্দেহ করিনি।
আমরা ভেবেছিলাম, বিয়ে করতে যাবার সময় বোধহয় সব ছেলেই এমনি বাধ্য-বিনয়ী হয়ে ওঠে। আমরা ভেবেছিলাম, বিয়ে জীবনের একটা স্মরণীয় পরিচ্ছেদ। হয়তো সেইজন্যেই খানিকটা লজ্জা, খানিকটা সংকোচ মিলিয়ে বরকে অমন সহিষ্ণু ক'রে তোলে। লোকে সেদিন তাকে যা করতে বলে তাই-ই সে করে, তাই সে নির্বিবাদে পালন ক'রে যায়। যে-অটলদা আমাদের অত উপদেশ দিয়ে এসেছে, স্বামী

বিবেকানন্দের ব্রহ্মচর্যের বাণী শুনিয়েছে, তার এই ব্যবহার দেখে মনে-মনে কেমন আমরা হতবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই ভেবেই সান্ত্বনা পেয়েছিলাম যে, অটলদা তো আর সমাজের বাইরের মানুষ নয়। অটলদাও তো আর-পাঁচ-জনের মত একজন সামাজিক জীব। সুতরাং কেনই বা বিয়ে করবে না। অন্যায়টাই বা কোথায়? কে বিয়ে করেনি? মহাত্মা গান্ধী, সি-আর-দাশ, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থেকে সুরু ক'রে প্রেসিডেন্ট জ্ঞানী জৈল সিং পর্যন্ত সবাই-ই তো বিয়ে করেছে! তবু অটলদা বিয়ে করাতে আমরা এত হতাশ হলাম কেন? তবে হয়তো এইজন্যেই কথাটা মনে এসেছিল যে, অটলদাকে সেই বরের পোষাকে যেন কেমন বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল। মুখের সেই দৃঢ়তা, চরিত্রের সেই ধার কোথায় গেল? না কি, সব বরকেই এইরকম বোকা-বোকা দেখায়! পৃথিবীতে যত বিয়ের বর দেখেছি, সকলের মুখখানা মনে আনবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু আশ্চর্য, তখনও আমরা কল্পনাই করতে পারিনি যে, অটলদা তখন আর এক ভাবনায় অস্থির। তখনও আমরা ধারণাই করতে পারিনি যে, অটলদার আর-একটা বউ আছে। তখনও আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, অটলদা একটা বউ থাকতে আর-একটা বিয়ে করতে গিয়ে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে।

কিন্তু এ-ও কি নির্বুদ্ধিতা? এক-একবার মনে হয়, নির্বুদ্ধিতাই যদি হবে তো অটলদা তাহ'লে অত বিচলিত হয়েছিল কেন? নির্বোধ লোকেরা তো বেপরোয়া হয়। বিচার-বিবেকশূন্য হয়। তাহ'লে? হয়তো অটলদার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। বুদ্ধিভ্রংশ হ'লে মানুষ বোধহয় অটলদার মত নিজের অমঙ্গল নিজে বুঝতে পারে না। বুদ্ধিভ্রংশ হ'লে মানুষ বুঝি একটা অপরাধ অন্য অপরাধ দিয়ে ঢাকতে চায়।

বিয়ের আসরে আমরা অটলদার পাশে গিয়ে বসেছিলাম।

দেখেছিলাম, অটলদা খুব ঘামছে দর-দর ক'রে। ভাবলাম, গরদের পাঞ্জাবি পরায় ঘামছে। কিংবা হয়তো। উত্তেজনা। অটলদাকে অমন ঘামতে দেখে একজন মাথার ওপরের পাখাটা জোর ক'রে খুলে দিয়েছিল। তবু অটলদার ঘাম কমেনি।

অটলদাকে এত ঘামতে দেখে আমরা অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, অটলদা তো সাধারণ মানুষ নয়। অটলদা কেন আমাদের মত অসহায় বোধ করবে নিজেকে।

আমাকে অটলদা বললে, এই শোন, এক গ্লাস জল দিতে বল তো?

আমি বললাম, জল খাবে? আজ কি তোমার কিছু খেতে আছে?

—তা হোক, বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে।

আমি কাকে আর জল আনতে বলবো? আশেপাশে পাত্রীপক্ষের অনেক লোক ঘোরাঘুরি করছে। তাদেরই একজনকে বললাম জলের কথাটা। কিন্তু তারপর সে জল দিলে কিনা তা দেখা হলো না! হঠাৎ আমাদের সকলের খাওয়ার ডাক পড়লো। আমরা দল বেঁধে সবাই খেতে চলে গেলাম। তারপরে কখন পাত্রীপক্ষেরা বরকে তুলে নিয়ে গেছে, কখন বরণ করা হয়েছে বরকে, কিছুই জানি না। আমরা তখন গরম-গরম লুচি দিয়ে বেগুন-ভাজা খাচ্ছি, ভেট্‌কি মাছের ফ্রাই খাচ্ছি, চিংড়ি মাছের মালাই-কারি খাচ্ছি, পোলাও খাচ্ছি—

হঠাৎ তখন ওদিকে হৈ-চৈ উঠলো। তুমুল হট্টগোল।

আমরা খাওয়া ছেড়ে বিয়ের আসরে গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড।

অধীর বোস বলতে-বলতে আবার থামলো। আমি বললাম—তারপর ?

অধীর বোস বললে, তারপর তো সব জানিস্ তোরা। এতদিনে সব-ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেল ভাই।

আসলে সেই থেকেই অটলদা আর অটলদা নেই। অটলদার জীবনের সূর্য এরপর থেকেই অস্ত গেল। এতদিনে বুঝতে পারলাম কেন অটলদার অধঃপতন হলো এমন ক'রে। হয়তো সেইদিনই বিয়ের সময়ে অটলদা যা ভয় করছিল, তাই-ই হয়েছিল। এই জন্যেই হয়তো অটলদা অত ঘামছিল। অত জল-তেষ্টা পাচ্ছিল তার।

তারপর বিয়ে শেষ হয়ে গেল। নির্বিবাদেই বিয়ে শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু তারপর আর জানতাম না। যে অটলদাকে না দেখে আমরা ভেবেছিলাম রাঁচি চলে গেছে, সেই অটলদা যে তখন ভবানীপুরের কুন্তি দেবীর বাড়ীতে ছিল, তা আমরা কেমন ক'রে কল্পনা করতে পারবো!

তখন তো ডায়েরি রাখতাম না। তাই সব ঘটনার সাল তারিখ মনে নেই। বহুদিন পরে অধীর বোসের কাছে সব ঘটনা শুনে আবার মনে পড়তে লাগলো। অথচ চিঠির মাথায় তো রাঁচির নামই লেখা ছিল। সেই রাঁচি থেকেই তো অটলদা লিখেছিল : বাঙালীদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। একে সংশোধন করতে হবে। এ না করলে জাত হিসেবে আমরা পেছিয়ে পড়বো। অন্য প্রদেশের লোকেরা হু-হু ক'রে এগিয়ে চলেছে। তোরা মানুষ হ'। কথায় আর কাজে এক হতে হবে। আমি বাইরে এসে দেখছি, এরা আমাদের মত নিষ্ঠাবান ক্ষমতাবান না হোক, উদ্যমী। এদের মধ্যে একতা আছে—যেটার অভাব আমাদের মধ্যে। আমি ফিরে গিয়ে আবার আমাদের ক্লাবে ব'সে বলবো সব তোদের। আমাদের নতুন ক'রে ভাবতে হবে। শিক্ষাই আমাদের যদি সার্থক না হয়, তাহ'লে জীবনে তো সমস্তই পণ্ডশ্রম!

এমনি আরো কত কথা লিখেছিল অটলদা।

আজ এতদিন পরে সব নতুন ক'রে মনে পড়তে লাগলো। সে-চিঠি কে লিখেছিল ? কোন্ অটলদা লিখেছিল ? যে অটলদা তখন কুন্তি দেবীকে বিয়ে ক'রে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে স্বর্গ-মর্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই অটলদা, না যে-অটলদা আমাদের বাদামতলার আদর্শ ছেলে, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ মন্ত্র-শিষ্য, সেই অটলদা ? একই মানুষের মধ্যে কি দু'টো বিরুদ্ধ-চরিত্র একই সঙ্গে বাস করে ?

সেই অতীতে যা-ই ক'রে থাকুক অটলদা, যে-ভুলই ক'রে থাকুক, এতদিন পরেও কি তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি ?

আর ভুলই বা বলি কেন ? কোথায় গেলেন সেই মঙ্গলবাবু! সেই ব্রজেনবাবু! ফরিদপুরে লাট-সাহেবের ট্রেনে যিনি বোমা ফেলেছিলেন, যাঁকে ধরবার জন্যে পুলিশ দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কেন অটলদা তাঁর সমস্ত

দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে গেল ? যদি কাঁধে তুলে নিতেই গেল তো তখনই নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দিলে না কেন ? কেন বড় হতে চাইলো অটলদা ? কেন সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি সম্মান পেতে চাইলো ? কেন নিজেকে বিলিয়ে দিলে না সকলের মধ্যে ? কেন সব মানুষের সেবার মধ্যে নিজের অহংকারকে ভুলতে পারলে ?

অধীর বোস চলে যাবার পর অটলদার আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনীটা শুনে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেলাম। অতীতের সব জানা, সব দেখা যেন আবার না-জানা, না-দেখা হয়ে গেল। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় ইন্দুলেখা দেবীর বাড়ীতে গেলাম। ভাবলাম, যেমন ক'রে হোক তার কাছ থেকে একটা জবাবদিহি আদায় করতে হবেই। ইন্দুলেখা দেবী তখন নিজের ভাড়া-বাড়িতে বাইরের ঘরে ব'সে কয়েকজন ছাত্রীকে পড়াচ্ছিলেন। আমাকে যেতে দেখেই উঠে এলেন। বেশ বিনীত-সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা করলেন।

বললেন, আপনি ? আমার সঙ্গে কোনও কথা আছে ?

বললাম, হ্যাঁ একটু নিরিবিলি হ'লে ভালো হতো—

ইন্দুলেখা দেবী বললেন, পাশের ঘরে আসুন, এ-ঘরে কেউ নেই—

বলে পাশের ঘরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। ভদ্র-সভ্য রুচিসম্মত ঘরের সাজ। আমাকে একটা চৌকিতে বসতে ব'লে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি কী-ভাবে কথাটা পাড়বো বুঝতে পারলাম না। এই এঁকেই কি আমরা এত শ্রদ্ধা করছি। ভুবনবাবু এঁকে দেখেই কি দেবী ব'লে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন! আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো। হঠাৎ বললাম, আমি বউবাজারে গিয়েছিলাম অটলদাকে একবার দেখতে।

ভেবেছিলাম, আমার কথাটা শুনে ইন্দুলেখা দেবী চমকে উঠবেন। কিন্তু না, তিনি তেমনি শান্ত গলাতেই বললেন, কেমন দেখলেন ?

বললাম, ভালো নয়।

—আমি কিন্তু শুনেছি তিনি ভালোই আছেন এখন।

সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললাম, কিন্তু আপনি তাকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছেন না কেন ?

ইন্দুলেখা দেবী এতক্ষণে চমকে উঠলেন। বললেন, তার মানে ?

বললাম, আপনি কি সত্যিই তাকে বাঁচিয়ে তুলতে চান, না মেরে ফেলতে চান ?

ইন্দুলেখা দেবী একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, আপনি ঠিক কী বলতে চান, বুঝতে পারছি না।

আরো স্পষ্ট করে বললাম, তাহ'লে পেনুড্রা-রোড থেকে ভালো হবার খবর শুনেও কেন হঠাৎ সেখানে টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন ? কেন কলকাতায় চলে আসতে চিঠি লিখলেন ? কেন কলকাতার এত জায়গা থাকতে বউবাজারে, এঁদো ড্যাম্প বাড়িতে তাকে এনে তুললেন ?

ইন্দুলেখা দেবী যেন হঠাৎ আমার মুখ থেকে এতখানি অভিযোগ আশা করেন নি।

বললাম, বলুন, জবাব দিন—

ইন্দুলেখা তখন যেন পাথর হয়ে গিয়েছেন।

অনেকক্ষণ পরে বললেন, আপনাকে কে এ-কথা বললে ?

বললাম, যেই বলুক, কথাগুলো সত্যি কি-না বলুন, আমি আপনার কাছ থেকে জবাব চাইতেই এসেছি। আপনি হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ টাকা রুগ্ন স্বামীর জন্যে খরচ করছেন এবং এখনও করছেন, এইটেই লোককে জানিয়েছেন। স্বামীর জন্যে আপনি উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন, সেইটেই লোককে বিশ্বাস করিয়েছেন। কিন্তু কার জন্যে এমন ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন ? কার কোন্ ভালোটা এতে সিদ্ধ হবে ! আপনার না অটলদার ?

ইন্দুলেখা দেবী তখনও চুপ ক'রে রইলেন। কোনও উত্তর তিনি দিলেন না। আমি বললাম, চুপ করে থাকবেন না, উত্তর দিন। আজ আমি এর জবাব নিয়ে তবে যাবো। বাইরের লোকের কাছে আপনি কেন দেবী হয়ে আছেন, এর আসল উদ্দেশ্যটা আমার জানা দরকার।

ইন্দুলেখা দেবী এবার চোখ নামালেন।

বললেন, তাহ'লে সবই শুনেছেন দেখছি—

বললাম, হ্যাঁ শুনেছি, শুনেছি আর বিশ্বাসও করেছি, শুধু আপনার জবাবদিহিটা জানবার জন্যেই আমার এখানে আসা। কারণ অটলদা আমাদের গুরু—

—আপনার গুরু ?

বললাম, হ্যাঁ, সেটা এতদিন আপনাকে জানানো হয়নি। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। আপনি বলুন, এত নিষ্ঠুর হতে পারলেন কেমন ক'রে ? লোকে ইঁদুরকে আধমরা ক'রে রেখে খেলা করে যেমন মজা পায়, আপনিও কি অটলদাকে নিয়ে সেইরকম মজা করছেন ?

দেখলাম, ইন্দুলেখা দেবীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তিনি তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিলেন। তারপর বললেন, আপনি কি এই কথা বলতেই এখানে এসেছেন ?

বললাম, হ্যাঁ, আর কী কথা থাকতে পারে আপনার সঙ্গে ?

—তাহলে জেনে রাখুন, আমি আমার স্বামীর ভালো-মন্দ নিয়ে যা-খুশী করবো, তাতে কারো কিছু বলবার অধিকার নেই। আমার স্বামীর ভালোটাও আমার হাতে, মন্দটাও আমার হাতে। তাতে আপনার কী ?

আমি সেই শান্ত-ধীর-স্থির মূর্তির মুখ থেকে কথাগুলো শুনে যেন স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেলাম।

ইন্দুলেখা দেবী আবার বলতে লাগলেন—যেদিন আমার স্বামী জেনে-শুনে আমার সর্বনাশ করেছিলেন, যেদিন আমার স্বামী আমার বাবাকে ঠকিয়ে আমার সঙ্গে গাঁট-ছড়া বেঁধেছিলেন, সেদিন তো আপনারা আমার স্বামীর কাছে জবাবদিহি চাইতে যাননি ? সেদিন তো আমার ওপর তাঁর নিষ্ঠুরতা দেখে তাঁর বাড়ি বয়ে গিয়ে তাঁকে ধিক্কারও দেননি ? তবে আজ কেন এসেছেন আমার কাছে আমার কাজের জবাবদিহি চাইতে ? যান, আপনি চলে যান—

এ-কথার পর আমার যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেল্।

ইন্দুলেখা দেবী বললেন—আমি আমার বাবার সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম, আর সেইসব সম্পত্তিই স্বামীর অসুখের পেছনে খরচ করেছি, সে কি

তাঁর উপকারের জন্যে? যে আমার সর্বনাশ করবে, আমি তার উপকার করবো, এ-কথা আপনারা ভাবতে পারলেন কেমন ক'রে?

—এর চেয়ে যে খুন ক'রে ফেলাও ভালো।

—কিন্তু তাতে তো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। খুন করলে তার তো শাস্তি হবে না, খুন করলে তার তো উপকার করা হবে।

বললাম, তাহলে বাঁচিয়ে রাখুন—

—কিন্তু সেও তো একই কথা। তাহ'লে তার আর শাস্তি হলো কই? এই বাঁচাও নয়, মরাও নয়, এইভাবেই আমি তাকে রাখতে চাই। মানুষটা জানুক্, সব মেয়েমানুষই নিরীহ গো-বেচারা নয়—মেয়েদেরও আত্মসম্মান-বোধ আছে—মেয়েদেরও প্রাণ বলে একটা জিনিস আছে।

তারপর হঠাৎ থেমে বললেন, অনেক রাত হলো, আপনি বাড়ী যান—এ-পাপের কোনও জবাবদিহি নেই, কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই।

তারপর আর সেখানে দাঁড়াইনি। হতবাক্ হয়ে ইন্দুলেখা দেবীর বাড়ী থেকে চলে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, জিনিসটা প্রচার ক'রে দেবো। ইন্দুলেখা দেবীর মিথ্যা গৌরবটুকু সমূলে ধুলোয় মিশিয়ে দেবো। কিন্তু তারপই হঠাৎ আমাকে তিন বছরের জন্যে কলকাতার বাইরে চলে যেতে হলো। ব্যাপারটা এমন ঘটলো যে, ভুবনবাবুকেও খবর দিতে যেতে পারিনি। সমস্ত রাজস্থানে ঘুরে বেড়ানোই ছিল আমার চাকরি। সে অন্য কাহিনী, অন্য পটভূমিকা, অন্য জগৎ। সে-প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

হঠাৎ একদিন ভুবনবাবুকে চিঠি লিখে এক অদ্ভুত উত্তর পেলাম। ভুবনবাবু লিখলেন—আপনি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন যে, আমাদের স্কুলের ইন্দুলেখা দেবী হঠাৎ আত্মহত্যা ক'রে এখানকার অধিবাসীদের মর্মাহত ক'রে দিয়েছেন। কেন যে তিনি এ-কাজ করতে গেলেন কে জানে। তাঁর মত টিচার পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। পুলিস এর রহস্য ভেদ করতে পারেনি। আমরাও কিছু বুঝতে পারছি না কেন উনি নিজেকে এমনি ক'রে নিয়তির পায়ে বলি দিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এখানে আমাদের স্কুলে বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সকলেই একবাক্যে বক্তৃতা দিলেন যে, তাঁর মত সতী, পতিভক্তি-পরায়ণা মহিলা এ জগতে দুর্লভ। আমরা সকলে তাঁর স্বর্গত আত্মার মুক্তি কামনা ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। স্কুলে তাঁর একটা তৈলচিত্রও টাঙাবার প্রস্তাব পাশ হয়েছে। এ খবরে আপনি নিশ্চয়ই খুশী হবেন, আশা করি।

এ-চিঠি পাবার পর আমি অটলার খবরের জন্যেও চিঠি লিখেছিলাম ভুবনবাবুকে। অধীর বোসকেও লিখেছিলাম। কিন্তু কেউই অটলদার খবর দিতে পারেনি। তিন বছর পরে যখন কলকাতায় ফিরে এলাম, তখন বউবাজারে সেই ঠিকানাতেও একবার

গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা অটলদার কোনো সন্ধানই দিতে পারলে না।
হয়তো অটলদাও আর এ-পৃথিবীতে নেই। কুন্তি দেবীও নেই। কিন্তু পৃথিবীর কোনও কোণে যদি আজও তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে, তবে প্রার্থনা করি—যেন অটলদা একটা মুহূর্তের জন্যও একটু শান্তি পায়। যশ সবাই পায় না, অর্থও সবাই পায় না। পেলেও তা জীবনে অনেকেই কাজে লাগাতে পারে না। তার চেয়েও মূল্যবান বস্তু শান্তি। জানি অটলদা সেই শান্তি চায়নি। লগ্নে যার ঝড়, সারা জীবনে তার শান্তি পাবার কথা নয়।
অটলদা আর ইন্দুলেখা দেবীর এই কাহিনী ভালোবাসার কাহিনী, না প্রতিশোধের কাহিনী, না নিছক নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের কাহিনী, তাও বুঝতে পারিনি এতদিন! এখনও বুঝতে পারছি না। কাহিনী যেমন ঘটেছিল তেমনই লিখে গেলাম। আপনারা এই কাহিনীর ভেতরকার তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে আনন্দ বা বেদনা একটা কিছু পেলেই আমি কৃতার্থ হবো।